যুদ্ধ কোন পথে?

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স,
১২, নারিকেল বাগান লেন,
কলিকাতা

দাম এক টাকা
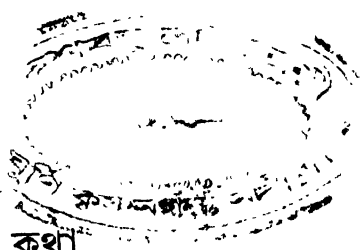
দু'টি কথা

আজকের দিনে মানুষ শত চেষ্টা করলেও অন্য থেকে আলাদা হয়ে থাক্‌তে পারবে না। জগতের এক দেশের সমস্যা অন্য দেশকে ভাবিত করেই তুল্‌ছে অবিরত। ভারতবর্ষ পরাধীন, শক্তিহীন, সবই ঠিক, কিন্তু তাকেও এখন অন্য দশ জনের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে হচ্ছে। আবার নিজেকে শক্তিমান্ ও স্বাধীন করতে হলেও দশজনের খবরাখবর রাখতে হবে, তাদের কল-কৌশল সবই আয়ত্ত করতে হবে। এসব কারণে দেশ-বিদেশের বর্ত্তমান অবস্থার কথা জানা একান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনীতির গতি কিরূপ, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিই বা কোন্ পথে চলেছে এসব বিষয় সাক্ষাৎ ভাবে জান্‌বার সুযোগ আমাদের নেই বল্‌লেই চলে। আমরা এখন যা' কিছু আয়ত্ত করতে পারি বই পড়ে। এরূপ বইও বাংলায় খুব কমই আছে। আমি এ বইখানিতে এসব বিষয় আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

বইখানিতে যে-সব বিষয় আলোচনা করতে চেয়েছি সে-সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। জগতের বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে বল্‌তে হলে বইয়ের কলেবর অসম্ভব রকম বাড়াতে হয়। এজন্য আমি প্রধানতঃ সেই দেশগুলি সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে যাদের গুরুত্ব সকলের চেয়ে বেশী। তবে এর খানিকটা ব্যতিক্রমও যে করা হয়েছে তা নয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটু বেশী করে বলেছি, আর এর সীমান্তবর্ত্তী দেশগুলি সম্বন্ধেও বিভিন্ন অধ্যায়ে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছি। প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সকলের আগে প্রয়োজন। আজকের দিনে এ প্রয়োজনীয়তা বেশী করেই অনুভূত হচ্ছে। আফগানিস্তান

চিত্রসূচী

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু

ত্রিপুরী কংগ্রেসের একটি দৃশ্য

আজকের দিনে বিজ্ঞানবলে জগতের বিভিন্ন দেশের ভেতরে একটা বিশেষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। আজ চীন জাপান, ইটালী, জার্ম্মানী, চিলি, পেরু মনে হয় আমাদের ঘরের দুয়ারে। লণ্ডন হতে টোকিও বা মেলবোর্ণ—এই পনর বিশ হাজার মাইল পথ তিন দিনে যাওয়া যায়, একথা কি কয়েক বছর আগে কেউ কল্পনাও করতে পেরেছে? আবার, বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে কতকগুলি দেশ আজ খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে, আর প্রত্যহ অন্যের ঘাড় মট্‌কাবার চেষ্টা করছে। তাই দেশ-বিদেশের খবরাখবর রাখা এখন মানুষের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সবার আগে জান্‌তে হবে নিজেদের অবস্থার কথা বিশেষ করে।

জগৎ কোন্ পথে

আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষের মানচিত্র তোমরা সবাই দেখেছ। এর প্রায় তিন দিকে সমুদ্র—মাইল হিসাবে ধরতে গেলে অনুমান সাত হাজার মাইল এই সমুদ্র-তীর। সমগ্র উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের রাজা হিমালয়। পশ্চিম দিকের খানিকটা, ইরাণ ও আফগানিস্তান ও পূব দিকের খানিকটা, চীন ও শ্যাম একে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে রেখেছে। এখানকার আবহাওয়া, গাছপালা, জীবজন্তু, এতই বিভিন্ন ধরণের যে, অনেকে একে একটা মহাদেশ বলে উল্লেখ করেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, সু-উচ্চ পর্ব্বত, ঘন জঙ্গল, 'বাংলার মত নদনদী বিধৌত শস্য-শ্যামল দেশ আবার রাজপুতনার মত নদীবিহীন বিস্তৃত মরুপ্রান্তর সবই এখানে রয়েছে। এজন্য আমাদের দেশকে একটি মহাদেশ বললে অগৌরবের কিছুই হয় না। কিন্তু স্বার্থপর লোকেরা আমাদের ভেতর ভেদবুদ্ধি বাড়াবার জন্যে অন্য অর্থে এ কথাটি প্রয়োগ করছে। ভারতবাসী এক জাতি, এক মন, এক প্রাণ হয়ে দেশের শ্রী বাড়াবার জন্য যাতে চেষ্টা না করে এদের সেই উদ্দেশ্য। আজ কিন্তু এদের ফাঁকি সকলে ধরতে পেরেছে।

ভারতবর্ষের এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি চিরন্তন ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। যুগে যুগে দেশের ওপর দিয়ে কত ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, তথাপি এই ঐক্যবোধ কেউ নষ্ট করতে পারে

নি। আজকের দিনের বিজ্ঞান এই ঐক্যবুদ্ধি আরও বাড়িয়েই দিয়েছে।

তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও পড়ছ। এ ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—হিন্দু-বৌদ্ধযুগ, মুসলমান যুগ, ইংরেজ যুগ। একে ঢেলে সাজবার প্রস্তাব চল্ছে। আজ ইংরেজী উনিশ শ উনচাল্লিশ সাল। এখন আমরা কোথায় এসে পৌছেছি? এর নির্দ্দেশ ইতিহাসের কাছে জিজ্ঞাসা কর—সে বল্তে পারবে। জাতির জীবনের পূর্ব্বাপর যোগসূত্র এতেই তোমরা পাবে। আজকের দিনের কথা কিন্তু তোমাদের বিশদভাবে জান্তে হবে, কেননা ভবিষ্যৎ তো তোমরাই গড়বে!

'স্বরাজ' কথাটির ভেতর দিয়ে ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বপ্রথম মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। বিগত ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতির মঞ্চ হতে দাদাভাই নৌরজী এই কথাটি উচ্চারণ করেন। তখন বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের মরশুম।

গত চৌত্রিশ বছরের ভেতর জগতের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ভারতবর্ষও ঠায় বসে নেই, নানা আন্দোলন আলোড়নের বন্ধুর পথে চল্তে চল্তে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে সে দাঁড়িয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন, 'হোমরুল' আন্দোলন, বিশ্বব্যাপী মহাসমর, অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন ভারতবর্ষের মুক্তি-সাধনার এক একটি ধাপ। স্বদেশী

আন্দোলন প্রথম বাঙালীর প্রাণে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগায়: গত যুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষে পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীনতা লাভ করবে। ইংরেজরাও তখন এ কথায় সায় দেয়। ভারতবাসী এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অজস্র ধন-জন দিয়ে যুদ্ধে তাদের সাহায্য করে। যুদ্ধের পর ভারতবাসীকে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হ'ল, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার পক্ষে এ মোটেই যথেষ্ট নয়।

এই সময়ে গুজরাট কাথিয়াবাড় নিবাসী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। মহাত্মা গান্ধী বলে ভারতবর্ষের সকলেই আজ তাঁকে চেনে। এ আন্দোলনের জের বহু বছর চলে। কিন্তু ইংরেজ তাতে কর্ণপাত করছে না দেখে ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আবার সক্রিয়ভাবে স্বরাজ আন্দোলন সুরু করলেন। এবারকার আন্দোলন নামও পেল যেমন নূতন,—এর রূপও হল তেমনি ভিন্ন। লবন আইন ভঙ্গ করেই হ'ল এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সুরু। পূর্ব্ব বারের অসহযোগ আন্দোলনের চেয়েও এবারকার প্রচেষ্টা বহু ব্যাপক ও বহুদূর প্রসারী হ'ল,—লক্ষাধিক লোক কারাবরণ করল। বছর খানেকের ভেতরই আন্দোলন খুব তীব্র হয়ে উঠল। এ সব দেখে বড়লাট লর্ড আরুইন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এ চুক্তির নাম হ'ল 'গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট'। এর পর গান্ধীজী লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ

দিলেন। ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ হবে তা ঠিক করার জন্যই এ বৈঠক আহ্বান করা হয়। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে কংগ্রেসের মুখপাত্ররূপে জাতির মনোগত অভিলাষ সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করলেন। ইংরেজ সরকার তাঁর কথায় কর্ণপাত করেন নি। তিনি স্বদেশে ফিরে এসে আবার জেলে গেলেন। এবারকার আন্দোলন তেমনভাবে সুরু না হতেই সরকার কঠোর হস্তে একে দমন করতে চেষ্টা করলেন।

গোলটেবিল বৈঠক পর পর তিন বার আহ্বান করা হয়। মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় বারের বৈঠকে যোগ দেন। তৃতীয় বারে যখন বৈঠক বসে তখন তিনি জেলে। তিন বারে গোলটেবিল বৈঠকে যে-সব আলোচনা হয়েছিল তাকে নির্দ্দিষ্ট রূপ দেবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দ্বারা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়,—ভারতের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো হন এর চেয়ারম্যান। ভারতের নির্ব্বাচকমণ্ডলী কিরূপ গঠিত হবে তা নির্ণয়ের জন্য এ সময় লর্ড লোথিয়ানের সভাপতিত্বে ভারতবর্ষে এক কমিশনও প্রেরণা করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখ্‌ছি যে, এবার ভোটদাতার সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। এক শ' জনের ভেতর চৌদ্দ জনের ভোট দেবার অধিকার জন্মেছে। এখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ যে-কেউ, অবশ্য সাবালক হলে, ভোট দানের অধিকারী। তোমরা এই পরীক্ষাটি পাশ কর, একুশ বছর বয়স হলেই ভোট দিয়ে

শাসন পরিষদে সদস্য পাঠাতে পারবে। ভারতবর্ষে এখন তিন কোটী নরনারী ভোট দিতে পারে। এর আগে ডায়ার্কির আমলে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র পঁচাত্তর লক্ষ!

ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র খানিকটা চালু হয়েছে। এ সময় আগেকার কথাও তোমরা কিছু জেনে রাখো। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে এশিয়াবাসীদের মনে একটি বিশেষ কারণে নূতন আশার সঞ্চার হয়। তখনকার দিনে ক্ষুদ্র জাপানের পক্ষে বিশাল রুশিয়াকে হারিয়ে দেওয়া কথার কথা ছিল না। প্রাচ্যের অন্য দেশগুলিও ভাবতে শেখে, তারাও শক্তিমানকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন হতে পারে। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের মূলে এই মনোভাব কার্য্য করেছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম বা শাসন-সংস্কার। ১৯১০ সালে ভারতবর্ষে এই শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়।

তোমরা ইতিহাস ভূগোলে পড়েছ, ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশ খাস ইংরেজের অধীন, অন্য অংশ দেশীয় রাজন্যদের অধিকারে। এ পর্য্যন্ত এদেশে যে-যে শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে সব ঐ প্রথম অংশের মধ্যে। আজকাল তোমরা 'ফেডারেশন' কথাটি খুবই শুনছ। এ-কথাটির অর্থ সম্মিলিত-রাষ্ট্র। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কথা তোমরা হয়ত শুনে থাকবে। সে দেশটিও এরূপ একটি সম্মিলিত-রাষ্ট্র। ভারতবর্ষে যদি কোন দিন সত্যিকার ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় তো এর আদর্শেই হবে।

আজকাল যে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার কথা হচ্ছে—তাতে খাস ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্যদের অধিকারভুক্ত ভারতও এর ভেতরে সন্নিবিষ্ট করা হবে। মর্লে-মিণ্টো রিফর্মে এর কিন্তু কল্পনাও হয়নি। তখন নির্ব্বাচন প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল মাত্র।

দেশ-শাসন ব্যবস্থায় দেশীয় প্রতিনিধিদের সহযোগিতা অর্থে আমরা যা বুঝি এবারে কিন্তু তা একেবারেই দেওয়া হয়নি। প্রতিনিধিরা শাসন ও আর্থিক বিলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার ও মতামত প্রকাশের অধিকার পান মাত্র। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ও নিখিল ভারত ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বত্রই একই ধারা অনুসৃত হ'ত। ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক্ পৃথক্ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন এ রিফর্মের আমলেই সুরু হয়। হিন্দু—হিন্দু প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে, মুসলমান—মুসলমান প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করবে ঠিক হয়। এ প্রথা জাতীয়তা-বোধ বাড়াবার পক্ষে কতখানি অন্তরায় হয়েছে তোমরা বড় হ'লে সব বুঝতে পারবে। এবারে মিউনিসিপ্যালিটীগুলির এলাকাভুক্ত লোকেরাই বিশেষ করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার গেল। পল্লীবাসীরা পেয়েছিল খুবই কম। কাজেই এ শাসন সংস্কারকে 'শহুরে' শাসন-সংস্কারও বলা যেতে পারে।

এর পরে এল 'ডায়ার্কি'—মানে দ্বৈত-শাসন। এখন লোকে নিত্য নূতন শিক্ষা লাভ করছে, তার কর্ম্মের পরিধি

প্রসারিত হয়েছে, অভাব অভিযোগও নিয়ত বেড়ে চলেছে। তাই শাসন-কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য একে কতক-গুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—যেমন, বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, কৃষি বিভাগ, শিল্প বিভাগ, আরও কত কি। প্রত্যেক বিভাগেরই একটি করে কর্ত্তা থাকেন, আবার সকলের উপরে থাকেন লাট সাহেবরা। এবারকার এই ডায়ার্কির আমলে শাসন-কার্য্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হ'ল। এক ভাগকে বলা হ'ল 'রিজার্ভড্' বা 'সংরক্ষিত', অর্থাৎ খাস লাট সাহেবের অধীনে এ বিভাগগুলি রাখা হ'ত, আর এ সবের কর্ত্তারা হতেন স্বয়ং রাজ-নিযুক্ত কর্ম্মচারী। এঁদের বিভাগীয় আয়-ব্যয় সকলই রাজ-ইচ্ছায় করা হত, ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদের এর উপর কোন কথা খাটত না। তবে এ অংশের কর্ত্তাদের ভেতরও বাঙালী বা ভারতবাসী ছিলেন। দ্বিতীয় ভাগটিকে বলা হত 'ট্রান্স্ফার্ড' বা 'হস্তান্তরিত'। এই ভাগটির কর্ত্তারা নিযুক্ত হতেন ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যদের ভেতর থেকে। এঁদের বেতন, বিভাগীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতির জন্য জবাবদিহি করতে হত ঐ ব্যবস্থাপক সভার নিকটে। এঁদের নাম দেওয়া হ'ল 'মিনিষ্টার' বা মন্ত্রী। ভারতবর্ষে প্রতিনিধি-মূলক শাসনের আংশিক সূত্রপাত হয় এসময় থেকে। কারণ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের অধিকাংশের ভোটের উপর নির্ভর

করত এসব মন্ত্রীর অস্তিত্ব ও কার্য্যাকার্য্যের বিচার। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ক্ষমতা কিন্তু আগেকার মতনই প্রায় রইল। সেনা-বিভাগ, বৈদেশিক বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগে সদস্যদের মতামত মোটেই গ্রাহ্য হয় না। অন্য কোন কোন বিষয়ের উপর তাঁদের ভোট দেবার অধিকার আছে। কিন্তু দেখা গেছে কোন প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হলেও বড়লাট বিশেষ ক্ষমতার বলে তা বাহাল করে নিয়েছেন! ডায়ার্কির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এবার শহর ছেড়ে 'সংস্কার' পল্লীতে প্রবেশ করল। এবারকার ভোটদাতারা প্রধানতঃ শহরের মধ্যেই আবদ্ধ না থেকে পল্লীর জনসাধারণের ভেতরও ব্যপ্ত হয়ে পড়ল। মর্লে-মিণ্টো রিফর্মে যে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা অনুসৃত হয়েছিল এবারে তা শুধু বাহালই রইল না, ভোট দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূর দূরান্তের নিভৃত পল্লীতে পর্য্যন্ত এ প্রথা ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলও এখন ফলছে। হিন্দু-মুসলমানে ভেদ-বুদ্ধি বেড়েই চলেছে।

ভারতে 'ডায়ার্কি' বা দ্বৈত শাসন চালু হয় ১৯২১ সালে। এর পর দীর্ঘ ষোল বছর পরে বর্ত্তমান ব্যবস্থা অংশতঃ প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অংশতঃ বলছি এজন্য যে, নিখিল ভারতীয় শাসন ব্যাপারে এখনও আগেকার ধারা ষোল আনাই বাহাল আছে। স্বদেশী যুগের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে এল মর্লে-মিণ্টো

রিফর্ম, আর মহাযুদ্ধের সময়ে পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে যে মুক্তি-বাসনা জেগে উঠল তা আংশিক চরিতার্থ করবার জন্য এল ডায়ার্কি। কিন্তু এতে দেশবাসী সন্তুষ্ট মোটেই হয় নি। এর প্রবর্ত্তনের প্রাক্কালে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড, তুর্কির খিলাফৎ ধ্বংস ইত্যাদি দিকে দিকে ভারতবাসীর অসহায়তার কথা জানিয়ে দিলে। নবাগত ডায়ার্কির সম্বন্ধে লোকের মনে ঘোর সন্দেহেরই সৃষ্টি হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন একে 'অভিনন্দিত' করে,—আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য আন্দোলন এর অসারতা প্রতিপাদন করে। কয়েক বছর ধরে দেশব্যাপী যে বিরাট মুক্তি আন্দোলন চলেছিল তার ফলে প্রথমে সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়, পরে বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকও আহূত হয়। লণ্ডনে বসে একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করেন। এই খসড়া আইনে পরিণত হয়ে এখন '১৯৩৫ সালের ভারতীয় আইন' নামে পরিচিত হয়েছে। এই আইনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে,—একটি প্রাদেশিক, অন্যটি নিখিল ভারতীয়।

ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। নূতন আইনে এগারটি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন চালু হবার কথা,—হয়েছেও তাই। কুর্গ, দিল্লী, বালুচিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি

ছোট ছোট প্রদেশে এ ব্যবস্থা বলবৎ হয় নি। ডায়ার্কির সঙ্গে এ আইনের তফাৎ ঢের। এখন সরকারী কোন বিভাগই 'সংরক্ষিত' বা লাট সাহেবের খাস অধীন নয়। সবগুলিই মন্ত্রীদের হাতে এসেছে। আগেকার আমলে সরকার মনোনীত কতকগুলি সদস্য ব্যবস্থাপক সভায় থাক্‌তেন, তাঁরা প্রায়ই সরকারের পক্ষে ভোট দিতেন। এখন এ ব্যবস্থা প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। যে-সব প্রদেশে দুটি ব্যবস্থা পরিষদ আছে সেখানে উচ্চতন পরিষদে এখনও কয়েকজন করে মনোনীত হচ্ছেন। এ ছাড়া, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলি এখন গণ-প্রতিনিধি দ্বারাই গঠিত বলা চলে। এ গণ-প্রতিনিধিদের ভেতর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তা থেকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হবার ব্যবস্থা এবারে হয়েছে।

আগে তোমরা জেনেছ, মর্লে মিণ্টো আমল থেকে ভারতবর্ষে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা চলে এসেছে। এবারে এতে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে-সব প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক সে-সব স্থানে স্বভাবতঃই ব্যবস্থা পরিষদে তাদের প্রাধান্য হয়েছে। মুসলমান আধিক্য প্রদেশগুলির ব্যবস্থা পরিষদেও মুসলমানদেরই প্রাধান্য ঘটেছে ঐ একই নিয়মে। এতে করে জাতীয়তার ভিত্তিতে দলগঠন একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জাতির স্বার্থের চেয়ে তাই সম্প্রদায়ের স্বার্থই বেশী করে দেখবার চেষ্টা চল্‌ছে।

কেউ নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গলকর কাজ করলে তাতে অন্য কারুর আপত্তি থাকে না। কিন্তু সম্প্রদায়গত স্বার্থ যখন জাতিগত বা সর্ব্বজনীন স্বার্থকে ছাপিয়ে ওঠে তখনই তা, কি সম্প্রদায়—কি জাতি—সকলের পক্ষে অকল্যাণের হয়। কয়েকটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এই সব ভেদনীতি দ্বারা চালিত হয়ে কার্য্য করছে, আর ভেদনীতির উদ্যোক্তারা আজ অন্তরালে থেকে মুচ্‌কি হাসি হাস্‌ছেন। এ সমূহ বিপদে কংগ্রেস কি নীতি অনুসরণ করছে তা তোমাদের জানা দরকার।

ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক অংশ যা সম্প্রতি চালু হয়েছে তাতে দোষ ত্রুটি বহু আছে। তাই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেও কংগ্রেস প্রথমে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় নি। কংগ্রেস এগারটির মধ্যে ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদেই সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে। সরকারের সঙ্গে কিছুকাল বাদানুবাদ চালাবার পর কংগ্রেস তরফে এসব স্থানে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। অন্য দুইটি প্রদেশেও পরে কংগ্রেসেরই সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। এখন আটটি প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা। জাতি ধর্ম্ম বর্ণের কথা ভুলে সকল মানুষের সেবা করা কংগ্রেসের লক্ষ্য। আর দীন দরিদ্রের সেবায় তৎপর হওয়াই এর প্রধান কাজ। কৃষক ও জন-মজুরদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আইন পাস করানো হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান

সকলেই সমানভাবে উপকৃত। এখন কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্ব যদিও আটটি প্রদেশে স্থাপিত হয়েছে, তথাপি সিন্ধু সমেত নয়টি প্রদেশই তার কার্য্যক্রম মেনে চল্ছে। বাংলা ও পঞ্জাবে এখনও কংগ্রেস কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। পৃথক নির্ব্বাচন প্রথাই এজন্য সর্ব্বপ্রকারে দায়ী। ভারত শাসন আইনে হিন্দুদের স-বর্ণ ও অ-বর্ণ (হরিজন) এই দুইভাগে ভাগ করে তাদের ভেতরও পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী যথাসময়ে মরণ পণ করে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বলে এ প্রথার অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। এখন স-বর্ণ অ-বর্ণ সকল শ্রেণীর হিন্দুকেই সকলের জন্য ভোট দিতে হয়, যদিও অ-বর্ণদের জন্য প্রত্যেক প্রদেশেই কতকগুলি আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।

তোমাদের নিকট ফেডারেশনের উল্লেখ করেছি। বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনের এক অংশে ফেডারেশন বা নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রয়েছে। এর কতকটা আভাষ আগে তোমরা পেয়েছ। ভারতবর্ষে ফেডারেশন বা নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে এই কয় বছরে ঢের বাদানুবাদ হয়েছে, এখনও বিতর্ক চলেছে খুব। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ফেডারেশন চালু করবার যে বেজায় চেষ্টা হবে তারও আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই এ সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষে একটী স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক এ এখন সকলেরই আন্তরিক অভিলাষ। কংগ্রেস আন্দোলন—এই বাসনাকে সর্ব্বজনীন করে তুলেছে। আজ নরম গরম সকল দলই চান—ভারতবর্ষে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠিত হোক। তাকে ফেডারেশন বল ক্ষতি নাই, যুক্তরাষ্ট্র বা সম্মিলিত রাষ্ট্র তাও বল্‌তে পার। ব্রিটিশ ভারত ও 'ভারতীয়' ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারী এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদের সুখ দুঃখ উন্নতি অবনতি এই রাষ্ট্রের কার্য্যকলাপের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত থাক্‌বে। কিন্তু এ রাষ্ট্র হবে স্বাধীন, স্বয়ংপূর্ণ। ভারতে এভাবে এক মহাজাতি গড়ে উঠবে, বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়ে তার থাক্‌বে অবাধ অধিকার। এরূপ যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশনই আমরা চাই। কিন্তু ভারত শাসন আইনে যে ফেডারেশন বা সম্মিলিত রাষ্ট্রের নমুনা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

যে ডায়ার্কি বা দ্বৈত-শাসনের অসারতা গত পনর বছরের ভেতর বার বার প্রতিপন্ন হয়েছে তা-ই প্রবর্ত্তন করার চেষ্টা চলেছে নিখিল ভারতীয় শাসন ব্যাপারে। প্রস্তাবিত ফেডারেশনে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় বিষয়ই থাক্‌বে সংরক্ষিত, খাস বড় লাটের অধীন, সামান্য সামান্য কিছু ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে আস্‌বে। তোমাদের এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে,

ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক যত টাকা আয় হয় (প্রায় দেড় শ' কোটি টাকা) তার শতকরা আশী টাকা ব্যয়িত হবে বড়লাটেরই ইচ্ছামত, বাকী কুড়ি টাকা ব্যয়ের ভার থাকবে ভারতীয়দের উপর। নিখিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের কোনরূপ মতামতই ঐ আশী টাকা সম্পর্কে গ্রাহ্য হবে না, তাঁরা মাত্র কুড়ি টাকার উপরই খবরদারি করতে পারবেন! তারপর নিখিল ভারতীয় এই যুক্তরাষ্ট্র পরিষদ কিভাবে গঠিত হবে তা একবার দেখ। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা মোট তিন শ' পঁচাত্তর। এর এক তৃতীয়াংশ ভারতের রাজন্যবর্গের ভেতর থেকে নির্ব্বাচিত হবে! বাকী যা থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ পাবে মুসলমানরা। শিখ, খৃষ্টান, ফিরিঙ্গী, ইউরোপীয় প্রভৃতিদের দিয়ে অবশিষ্টাংশ পাবে হিন্দুরা। এতেও কংগ্রেসের আপত্তি ছিল না—যদি জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিষদ গঠিত হত। কিন্তু তা হয়নি। যে ভেদ-বুদ্ধি এতকাল তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে, নিখিল ভারতীয় ব্যাপারে তাকে পাকা মসনদে প্রতিষ্ঠিত করতে দেওয়া জাতির পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল। তারপর দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশেই এখনও স্বৈর-শাসন প্রচলিত। এখানকার অধিবাসীদের ধন-প্রাণ, মান-মর্য্যাদা এসব স্বৈরাচারী রাজার খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করে। এদের আভ্যন্তরিক শাসনে সংস্কার সাধিত না হলে অর্থাৎ সেখানকার জনগণের হস্তে শাসনভার

অর্পণের সুবিধা করে না দিলে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিই যুক্তরাষ্ট্র-পরিষদকে ভারাক্রান্ত করবে, জন-প্রতিনিধিদের তাতে স্থান হবে না। তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতার পথে তাঁদের বিঘ্ন ঘটাবার সম্ভাবনা খুবই। বর্ত্তমানে করদরাজ্যের প্রজারা স্বায়ত্ত শাসন বা প্রতিনিধিমূলক শাসন কিছুটা চাইছে, কিন্তু রাজন্যবর্গ তাতে বাদ সাধছেন। শুধু তাই নয়, নানারূপ অত্যাচার অনাচারেও তাঁরা ক্ষান্ত হচ্ছেন না। কাজেই ভাবী যুক্তরাষ্ট্র পরিষদে তাঁরা কি মূর্ত্তি গ্রহণ করবেন তা সহজেই অনুমান করা চলে।

আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে তোমাদের জেনে রাখতে হবে। জাতির আত্ম-কর্ত্তৃত্ব লাভ করবার পক্ষে যে কয়টি বিষয় একান্ত দরকার তার কিছুই ভারতবাসীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় নি। দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রেল-বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জাতির ও দেশের উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয়গুলি খাস গবর্ণমেণ্টের হাতেই রয়ে গেছে। রাজস্বের শতকরা আশী ভাগ টাকাই এই সব খাতে ব্যয়িত হবে। সুতরাং তোমরা একবার ভেবে দেখ, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবৎ কংগ্রেস নানা দুঃখ বরণের ভেতর দিয়ে জাতির ও দেশের মুক্তি সাধনে যে-সব চেষ্টা করে এসেছে বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইনের ফেডারেশন অংশে তার কিছুই প্রতিফলিত হয়েছে কি না! হয়ত নাই-ই, বরং

উল্টো করে নানা অসুবিধাই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাদেশিক ব্যাপারে খানিক্‌টা আত্মকর্ত্তৃত্ব আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু নিখিল ভারতীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব না পেলে সবই যে মিছে হয়ে যাবে! তাই এর বিরুদ্ধে দেশে ঘোরতর আন্দোলন সুরু হয়েছে। দেশের মনীষিগণ প্রত্যেকেই ফেডারেশন বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু ভারত শাসন আইনে যে আকারে এ দেখা দিয়েছে তা গ্রহণ করতে সকলেই নারাজ। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো ভারতের নানা স্থানে ও নানা নামজাদা প্রতিষ্ঠানে ফেডারেশনের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি চান শীঘ্রই একে চালু্‌ করতে। জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে ঐক্যস্থাপন একান্ত দরকার, আর প্রস্তাবিত ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার উপরই একান্ত ভাবে এ নির্ভর করছে, এই বলে তিনি জনমত গঠনের প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু দেশের প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানগুলি এ ফেডারেশনের সম্পূর্ণ বিরোধী। কংগ্রেসের মতও দিন দিন স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু গেল বছর (১৯৩৮) কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, এবারেও তিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। প্রস্তাবিত ফেডারেশন যে জাতির পক্ষে ঘোরতর অকল্যাণের হবে রাষ্ট্রপতির বহু ভাষণে তা স্পষ্ট ও দৃঢ় ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে বড়লাটের দৃঢ়তা আর অন্যদিকে কংগ্রেসের তথা জাতির কঠোর মনোভাব—

এ দুয়ের কোথায় কি ভাবে সামঞ্জস্য হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কেউ কেউ একটা ভাবী সংঘর্ষেরও আভাষ দিয়েছেন। কিন্তু জগৎ ক্রমশঃ যেমন একটা আসন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন হচ্ছে—তাতে এরূপ কিছু নাও ঘট্‌তে পারে। ভারতবর্ষ তো আর জগৎ ছাড়া নয়। আজকের দিনে জগতের যেখানেই যা কিছু ঘট্‌বে তার ঢেউ এখানে পৌঁছবেই। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ ভারতবাসীর সঙ্গে আপোষ-রফা করতেও পারে।

কংগ্রেসের কথা তোমাদের অনেক কিছু বল্‌লাম। তোমরা বুঝতেই পারছ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় এর কৃতিত্ব কতখানি। কংগ্রেস ভারতবাসীকে নব জীবন দান করেছে। কংগ্রেসের মূলে কে ছিলেন জান? জাতি যখন স্বাধীন হবে, তখন তাঁর কথা লোকে সকলের আগে স্মরণ করবে। তিনি হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমরা বড় হয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও জাতির প্রাণে একটা নূতন সাড়া এনে দিয়েছিলেন। তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে কংগ্রেসের কার্য্যে মনপ্রাণ সঁপে দেন।

জগতের আসন্ন সঙ্কটের নিরিখে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ সে কথাও আমাদের জেনে রাখা দরকার। বিমানপোত দূরকে নিকট করেছে, এতে চড়ে ঘণ্টায় চার শ মাইল পর্য্যন্ত যাওয়া চলে। ইটালী আবিসিনিয়া অধিকার করেছে, জার্ম্মানী বাগ্‌দাদ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তারের স্বপ্ন দেখ্‌ছে,

পূর্ব্ব এশিয়ায়, জাপান চীনের ভেতরে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এসব স্থান ভারতবর্ষ হতে বেশী দূরে নয়। আবার, মুখে যে যাই বলুক, উপলক্ষ্য যা-ই হোক, ইটালী, জার্ম্মানী ও জাপানের মূল লক্ষ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ভারতবর্ষের নিকট প্রতিবেশী আফগানিস্তান, ইরাণ, ইরাক, আরব, শ্যাম প্রভৃতি দেশগুলি নিজ নিজ সাধ্যমত অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে। আসন্ন মহাসমরে কে কোন্ দিকে যাবে ঠিক নেই। তবে এখন পর্য্যন্ত যতটা জানা গেছে, তাতে মনে হয়, শ্যামে জাপানের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়েই চলবে, আর আফ্‌গানিস্তান, ইরাণ, আরব প্রভৃতি অঞ্চলে ইটালী জার্ম্মানী নানা ভাবে নিজ শক্তি প্রকাশ করবে। বিশ্বের চারদিকে, এবং ভারতবর্ষের অতি নিকটেও যখন প্রবল পক্ষ হানা দিচ্ছে তখন ভারতবর্ষ আত্মরক্ষার জন্য কি আয়োজন করছে, তা তোমরা নিশ্চয়ই জান্‌তে চাইবে।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি। একে রক্ষা করবার জন্য প্রায় দু' শ বছর যাবৎ ব্রিটেন কি চেষ্টাই না করছে, তার বৈদেশিক নীতিও একে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। খাস জমিদারী রক্ষায় প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন কি? তাই যদিও আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীকে ক্রমে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, দেশ রক্ষা ব্যাপারে কিন্তু সে কোন ক্ষমতাই পায় নি,এমন কি তার কোন প্রস্তাবকে আমলেই

আনেনি। আবার যখন একদিকে আন্তর্জাতিক সঙ্কট উপস্থিত, আর অন্যদিকে সাড়ম্বরে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলেছে, তখনও তাকে এ বিষয়ে মোটেই আমল দেওয়া হচ্ছে না! এর পরিণাম ভেবে দেশবাসী আতঙ্কিত না হয়ে পারছে না।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত—যেখান থেকে যুগে যুগে বিদেশীরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে, তার দৈর্ঘ্য সাড়ে পাঁচ শ' মাইল। নানা দিক থেকে যখন ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তখন ব্রিটেন একে রক্ষার জন্য কতটা আয়োজন করেছে দেখা যাক্। প্রতি বছর এই খাতে ভারতের অর্থ ব্যয় হয় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কোটী টাকা। এখানে স্থল সৈন্য রয়েছে দু' লক্ষের কিছু উপর। কিন্তু আজকাল বিমান আক্রমণেরই সব চেয়ে বেশী ভয়। এখানে সমরোপযোগী বিমানপোত যা রয়েছে তা হাতের আঙুলে গণনা করা যায়। আটটি স্কোয়াড্রন মাত্র বিমানপোত, আর কর্ম্মচারী সংখ্যা আড়াই হাজারের কিছু উপর! আর নৌবহর? যে দেশের সমুদ্রতীর সাত হাজার মাইল দীর্ঘ তার পক্ষে নানা শ্রেণীর আটখানা জাহাজ থাকা নির্ম্মম পরিহাসের বিষয় নয় কি? ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বছর ব্রিটেনকে একলক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হত, তার জাহাজগুলি ভারত-উপকূল রক্ষা করে বলে। এখন আদেশ হয়েছে ভারতবর্ষকে আর এ টাকা দিতে হবে না, এর

বদলে তাকে ছ'খানা যুদ্ধ জাহাজ তৈরি করে নিতে হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে দেশ-রক্ষা বিভাগের তরফ থেকে আজকাল বিমানপোত আক্রমণের মহড়া দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু তা প্রয়োজনের পক্ষে অতি সামান্য। আজ জনসাধারণের ভিতর সামরিক শিক্ষা লাভের খুবই আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার দেশবাসীকে সামরিক শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যতদিন দেশ-রক্ষা বিভাগ সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে আসরে না নামবে ততদিন এ খণ্ড প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না।

দেশ-রক্ষা বিভাগ এখনও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে পূর্ণভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রস্তাবিত ফেডারেশনেও এই ব্যবস্থাই বাহাল রয়েছে। দেশ-রক্ষা বা শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা প্রত্যেক দেশবাসীর মৌলিক অধিকার ও কর্ত্তব্য। ভারতবাসী আজ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। যে শাসন ব্যবস্থা তাকে এ অধিকার হতে বঞ্চিত করবে, তা তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতেই পারে না। জাতীয় কংগ্রেস এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। দেশ-রক্ষার সঙ্গে দেশের পররাষ্ট্র-নীতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কংগ্রেস এ বিষয়ও আলোচনা করছে। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রমূলক শাসন চায়। কাজেই যেখানে গণতন্ত্রের বিপদ উপস্থিত সেখানে যথাশক্তি সাহায্যদান ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য বলে কংগ্রেস মনে করে। নিপীড়িত জাতি সমূহের

সাহায্যেও আমরা অগ্রসর হব। স্পেন ও চীনে রসদ, ঔষধ ও চিকিৎসক প্রেরণ এই নীতিরই অঙ্গ। ভারতবর্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গেও মৈত্রীভাব বজায় রাখতে ইচ্ছুক। সে পরাধীন। কোন প্রবল শক্তি অন্য কারুর স্বাধীনতা হরণ করে তা সে একেবারেই চায় না। কংগ্রেস জাতির এই মনোভাব কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা করছে। তার পররাষ্ট্র-নীতিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্ছে। কিন্তু 'শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না', কথা প্রতিপালিত করতে হলে পেছনে শক্তি থাকা চাই। কংগ্রেস, জাতির হয়ে আজ এ শক্তি লাভ করতে চাইছে। চারদিকের ছোট ছোট দেশগুলিও বসে নাই। তারাও আজ শক্তি অর্জ্জনে মন দিয়েছে।

—এক—

শ্যাম

ভারতবর্ষ পরাধীন বটে, কিন্তু তার পূর্ব্ব পশ্চিমে এমন কয়েকটি দেশ আছে যারা যুগ যুগ ধরে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছে। আজকের জগতের সঙ্গে সমান তালে চলবার জন্য তারা চেষ্টাও করছে অবিরত। চীনও ভারত সীমান্তের একটি দেশ, কিন্তু তার কথা এখন বলব না। এ এত বিশাল, আর আজকের দিনে এর সমস্যা এত জটিল হয়ে পড়েছে যে, এর কথা তোমাদের পরে বিশেষ করে বলতে হবে। ভারতবর্ষের পূবে আর একটি স্বাধীন দেশ হচ্ছে শ্যাম, আর পশ্চিমে হচ্ছে আফগানিস্তান ও ইরাণ বা পারস্য। এদের কথাই এখন তোমদের বলব।

'বৃহত্তর ভারত' এই কথাটি তোমরা হয়ত শুনেছ। আগেকার দিনে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল—তখন তার শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম বাইরে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পূবে পশ্চিমে উত্তরে

নানা স্থানে এর নিদর্শন আজও আমরা পাই। পূবের দেশগুলিতে ভাষায়, সাহিত্যে ও লোকজনের আচার-ব্যবহারে ভারতীয় ছাপ এখনও স্পষ্ট দেখতে পাবে। শ্যামের লোকদের আদিত্য, রামচন্দ্র, মনুধর্ম্ম ইত্যাদি নামগুলি সংস্কৃত ঘেষা। আর এ হবেই বা না কেন? শ্যামের বেশীর ভাগ লোকই ত বৌদ্ধ। আর রাজাও হলেন তথাগতেরই উপাসক।

শ্যামের লোকেরা এদেশটির নাম দিয়েছে 'মুয়াং ঠাই', ইংরেজীতে এর মানে করা হয়েছে 'স্বাধীন লোকের দেশ'। আমরা কিন্তু আর এক ভাবে এর মানে করতে পারি—'মুয়াং মানে 'আমার', আর 'ঠাই মানে 'স্থান', 'দেশ', অর্থাৎ 'আমার দেশ'। শ্যাম—তার 'বাসিন্দাদেরই দেশ, অন্য কারো নয়। অনেকে ভেবে আশ্চর্য্য হন, কেমন করে এদেশটি বড় বড় শক্তির সম্মুখে নিজ স্বাধীনতা বজায় রাখলে। কেউ বলেন, ইংরেজ ও ফরাসীদের ভেতর নিয়ত দ্বন্দ্ব লেগে ছিল বলে এর উপর তারা আর নজর দিতে পারেনি। এর ভেতর খানিকটা সত্য হয়ত আছে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এখানকার অধিবাসীরাও খুব তেজী, সাহসী। দীর্ঘকাল স্বাধীনতা ভোগ করার দরুন জাতির স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখ্‌তে এরা অভ্যস্ত। শ্যাম আজ ছ' শ বছর ধরে একাদিক্রমে স্বাধীন রয়েছে! চীন থেকে ইরাণ এই দীর্ঘ পথে একমাত্র শ্যামই স্বাধীনতার পতাকা উচিয়ে রেখেছে।

সীমান্তের পরে

শ্যাম একটা বড় দেশ নয়, আয়তনে আমাদের বাংলা, বিহার, আসাম এই তিনটি প্রদেশ জুড়লে যতখানি হয় ঠিক ততখানি। অথচ এর লোক সংখ্যা খুবই কম—মাত্র দেড় কোটি! আমাদের ঐ তিনটি প্রদেশে লোক সংখ্যা কত জান? নয় কোটীর কম হবে না। তবে শ্যামের অর্দ্ধেকটাই বন জঙ্গলে ভরা। এই জঙ্গলে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জীব আছে যার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য দূর-দূরান্তর থেকে এখানে লোক আস্‌ছে—আর বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে। শুনেছি আমেরিকার বহু প্রাণীবিদ্ ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এখানকার গহন বনে নানা রকম জীবজন্তুর পরীক্ষাগার স্থাপন করেছেন, এদের হালচাল, আচার-ব্যবহার, এমনকি কথাবার্ত্তারও সূত্র আবিষ্কার করবার জন্য!

শ্যামের শাসন ব্যাপারে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন ঘটেছে মাত্র কয়েক বছর আগে—গত ১৯৩২ সালে। এর ঢের আগে থেকেই কিন্তু শ্যামবাসীরা এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের ঢেউ এসে এর তীরে পৌঁছে। রাজা মহাচুলালংকর্ণ তখন শ্যামের রাজা। তিনি ছিলেন চক্রী রাজবংশীয়। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত এখানে তিনি রাজত্ব করেন। চুলালংকর্ণ জবরদস্ত রাজা। একদিকে তিনি ইংরেজ-ফরাসী দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বাধীনতা অটুট রেখেছিলেন, যদিও বিদেশীদের কিছু কিছু

অধিকার তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল ; অন্যদিকে দেশের রেলপথ বিস্তার, ডাক ও তার বিভাগ স্থাপন এবং শিক্ষা সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। সরকারী অর্থে শ্যামবাসী যুবকদের লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো স্বরু হয় এই সময় থেকে।

রাজা চুলালংকর্ণের অনেকগুলি বিয়ে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম রাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রাজা ষষ্ঠ রাম' এই নাম নিয়ে শ্যামের রাজা হলেন। ১৯১০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। রামচন্দ্র লোকটি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি সেক্সপীয়ারের নাটক শ্যামের ভাষায় অনুবাদ করেন। নিজেও নাটক লিখ্‌তেন আর অভিনয় করতেন। শাসনকার্য্যে তাঁর আদৌ মন ছিল না। রাজা চুলালংকর্ণের ছেলেও অনেকগুলি। কা'র পর কে রাজা হবেন তা তিনি ঠিক করে দিয়ে যান। ষষ্ঠ রামদেবের পর রাজা হওয়ার কথা ছিল তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই মহীদলের। মহীদল রাজসিংহাসনের কখনো প্রত্যাশী ছিলেন না। তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড ও জন হপ্‌কিন্স বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিখেছেন। এখন তিনি নিউ ইয়র্কের আল্‌বানিতে চিকিৎসা ব্যবসা করছেন। একজন সাধারণ শ্যামদেশীয় যুবতীর পাণিগ্রহণ করে সেখানেই রয়ে গেছেন। শ্যামের ভাবী রাজা আনন্দ মহীদল এঁরই পুত্র। আনন্দ কেমন করে রাজসিংহাসন পেলেন তাই তোমাদের এখন বল্‌ছি।

সীমান্তের পরে

রাজা ষষ্ঠ রামের মৃত্যুর পর যখন মহীদল আর দেশে ফিরে এলেন না তখন তাঁরই কনিষ্ঠ প্রজাধিপক শ্যামের সিংহাসন পেলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এখানে রাজত্ব করেন। শেষোক্ত সালে তিনি রাজ-মসনদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। রাজা প্রজাধিপক এখন ইংলণ্ডের সারে নামক্ স্থানে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করছেন। এঁর সময়ই শ্যামের শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। রাজা প্রজাধিপক উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত। তিনি রাজা চুলালংকর্ণের প্রগতিমূলক ব্যবস্থা সবই বাহাল রাখলেন, আবার দেশের ধনসম্পদ বাড়াবার জন্য নানারূপ উপায়ও করে নিলেন। বিদেশীরা শ্যামে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। ইংরেজীতে এক কথায় একে বলে "ক্যাপিটুলেশন"। কোন বিদেশী যদি কোন রকম অপরাধ করত তাহলে তার বিচার হত তাদের স্থাপিত বিচারালয়ে। শ্যাম রাজ্যে বসে শ্যামের আদালতে এদের বিচার হত না! এ বিসদৃশ ব্যবস্থা যে শুধু শ্যামে ছিল তা নয়, চীন, জাপান, ইরাণ, তুর্কী প্রাচ্যের সব স্বাধীন দেশেই এই ব্যবস্থা কম বেশী বিদ্যমান ছিল। এ প্রথা একে একে এখন প্রায় সব দেশ থেকেই লুপ্ত হয়েছে। শ্যামেও এখন এই প্রথা নেই। এই শতাব্দীর গোড়া থেকেই শ্যামবাসীদের ভেতর শিক্ষা দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। বিদেশে ছাত্র ও যুবকপাঠাবার কথা তোমাদের বলেছি। কেউ যুদ্ধবিদ্যা, কেউ আইন,

কেউ অর্থনীতি—এই রকম নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে আর দেশ-বিদেশের নূতন নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যুবকদল দেশে ফিরতে লাগ্‌ল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রায় সব দেশ থেকেই উঠে গেছে। যেখানে রাজা বিদ্যমান সেখানেও সাধারণের মত অনুযায়ী তাঁকে চল্‌তে হয়। সাধারণের মতামত নেওয়া হয় তাদের প্রতিনিধি সভা মারফত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্যামের যুবকদল নিজেদের দেশে এইরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তন করতে চাইলে। তারা দেশে ফিরে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত হ'ল। নৌ-বিভাগ, সৈন্য-বিভাগ, পুলিস-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, শাসন—আইন-আদালত বিভাগ সকল বিভাগেই এরা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু এর অধিকাংশেরই কর্ত্তৃত্ব করতে লাগল রাজপরিবারের লোকেরা। তারা ছিল আইন-কানুনের বাইরে, আর তাদেরই উদরপূর্ত্তি করতে রাজস্বের বেশীর ভাগই ব্যয় হয়ে যেত। তাই গত ১৯৩২ সালে নব-শিক্ষিত কর্ম্মচারী যুবকদল বিপ্লব উপস্থিত করলে।

এ বিপ্লবে কিন্তু একটি প্রাণও নষ্ট হয়নি। তোমরা বড় হয়ে ইতিহাসে অনেক 'রক্তহীন বিপ্লবে'র (ব্লাড্‌লেস্ রিভলিউশন) কথা পড়বে। এ বিপ্লবও তেমনি একটি। রাজপরিবারের লোকেরা একে একে এদের হাতে বন্দী হ'ল। রাজা প্রজাধিপক তখন রাজধানী ব্যাঙ্ককে ছিলেন না। তিনি বিপ্লবের সংবাদ পেয়ে রাজধানীতে ছুটে এলেন। তিনি

প্রথম নিজে সব পরখ করে দেখলেন, পরে বিপ্লবীদের তৈরী শাসন ব্যবস্থার খসরায় সহি করলেন। লোকে রাজাকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌ল। রাজার তখন এ না করে উপায়ও ছিল না। তথাপি তিনি যে একজন প্রগতিশীল রাজা ছিলেন তা তেমাদের বল্‌তেই হবে।

এর পর ১৯৩৩ ও ৩৪ সালে দুটো ছোট-খাটো বিপ্লব হয়। ছোটখাটো হলেও শেষোক্তটা খুবই মারাত্মক হয়েছিল। চৌত্রিশ সালের বিপ্লব ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। পুনরায় স্বৈর শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য রাজপরিবারের লোকেরা এবং দেশের সম্ভ্রান্ত ও বড়লোকেরা একযোগে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। বিচারে এদের কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হয়। কারো ফাঁসি দিতে হলে রাজারও সম্মতি নিতে হয়। যখন শেষোক্ত বিপ্লব ঘটে তার আগেই রাজা প্রজাধিপক বিলাতে চোখের চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ বিপ্লবের যোগ ছিল না। তথাপি তিনি ওদের ফাঁসির হুকুমে সম্মতি দেননি, এর বদলে ডাকযোগে তাঁর সিংহাসন ত্যাগের কথা শাসন-পরিষদকে জানিয়ে দিলেন। শ্যামের শাসন-পরিষদ মহীদলের পুত্র বালক আনন্দ মহীদলকে ভাবী রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

আনন্দ মহীদল ১৯২৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স এখন চৌদ্দ বছরও হয়নি। আনন্দ এখন

সুইজারলণ্ডে থেকে শিক্ষা লাভ করছেন। তাঁর জন্ম বিদেশে, মাত্র গত বছর (১৯৩৮) নবেম্বর মাসে প্রথম শ্যামে গিয়েছিলেন। আগামী ১৯৪১ সালে ষোল বছর বয়স পূর্ণ হলে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করবেন। এখন তাঁর হয়ে এক রাজপরিষদ কাজ চালাচ্ছেন। ১৯৩২ সালের বিপ্লবের পরে যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয় তাতে সাধারণের ক্ষমতাই প্রবল হয়েছে। রাজা না থাক্‌লেও দেশ শাসনে ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা নেই। নূতন শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রের আদর্শে রচিত। সরকারের সকল ক্ষমতার উৎস হ'ল সমগ্র শ্যামজাতি, আর রাজা হলেন জাতির প্রতিভূ বা মুখপাত্র। ইংলণ্ডের রাজার যে ক্ষমতা, এঁর ক্ষমতাও প্রায় তদ্রূপ। পার্লামেণ্ট বা ব্যবস্থা-পরিষদই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। শ্যামে রাজস্বের বিলি-বন্দোবস্ত, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্ধিবিগ্রহ, শাসনের সকল রকম ব্যবস্থা আইন প্রণয়ন সকলই ব্যবস্থা-পরিষদের মত নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্পাদন করেন। ব্যবস্থা পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ মত রাজা মনোনীত করেন, আর অর্দ্ধেক হন জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত। চার বছর অন্তর নূতন নির্ব্বাচন হয়। দশ বছর পরে সকল সদস্যকেই জনসাধারণ নির্ব্বাচন করবে। 'পিপল্‌স্ পার্টী' বা গণ-দল এখন শ্যাম শাসন করছে বলা যেতে পারে। চীনের কুমিণ্টাং দলের মত এই দল দেশের শাসন ব্যাপারে

কর্ত্তৃত্ব করে। এখনও পর্য্যন্ত এখানে এই একটী মাত্র দল রয়েছে। ব্যবস্থা পরিষদের স্বদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দেবার অধিকারী কুড়ি বছর বা তদূর্দ্ধ সকল সাবালক নরনারী। শ্যামের জননায়করা বলেন, সাধারণ লোকেরা এ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হলে এও একটী পুরোপুরী গণতন্ত্রে পরিণত হবে, যদিও ইংলণ্ডের ন্যায় রাজাকেও তাঁরা স্বীকার করে নেবেন।

শ্যামের রাষ্ট্রীয় চেহারা এই অল্প দিনের ভেতরেই বদলে গেছে। রাজনীতির দিক দিয়ে জনগণ এখন মুক্ত, অর্থনীতির দিক দিয়ে তাদের মুক্ত হতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে বলে মনে হয়। জমির খাজনা সম্পর্কে এক এক জায়গায় এক এক নিয়ম, বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দিষ্ট মান নেই। রাষ্ট্রনেতারা এখন এসব দিকে মন দিয়েছেন। শ্যামে ধান হয় প্রচুর। বাঙালীদের মত শ্যামের লোকেরাও অন্নজীবী। এখানকার ধন সম্পদ বাড়াবারও চেষ্টা চলছে খুবই। শ্যামের দ্বার সকলের নিকটেই মুক্ত। তোমরা শুনে সুখী হবে, বিদেশীদের ভেতর বাঙালীও এখানে রয়েছে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যও করছে। তবে জাপানীরাই ব্যবসা-বাণিজ্যে এখানে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কারো কারো মতে জাপানীদের প্রভাব শ্যামে খুব বেড়ে গেছে। রাজা প্রজাধিপকের আমল পর্য্যন্ত ইংরেজ প্রভাব শ্যামে বলবৎ ছিল। এখন তাতে ভাটা পড়েছে।

শ্যামের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক কি, আর আত্মরক্ষার জন্য ব্যবস্থাই বা সে কি করেছে তা আমাদের এখন জানতে হবে। শ্যাম ছোট দেশ, ধনসম্পদ আহরণের ব্যবস্থা এখনও তেমন হয়নি। কৃষিই এখন পর্য্যন্ত লোকের প্রধান জীবিকা। শিল্প বা বাণিজ্য তাদের তেমন বাড়ে নি। এজন্য প্রয়োজন মাফিক অর্থের সেখানে বড়ই অভাব। তারা বিদেশ থেকে ঋণ নিতেও ভরসা পায় না। ঋণ-দাতারা অনেক ক্ষেত্রেই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়। অনেক দেশ এভাবে স্বাধীনতা হারিয়েছে। অর্থাভাব হলেও শ্যাম দেশ-রক্ষার আয়োজন করতে ভোলে নি। এখানে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বাধ্যতামূলক, প্রত্যেক সমর্থ লোককেই যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হয়। এজন্য বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্য পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার থাক্‌লেও আপৎকালে সাধারণ লোকেরাও যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারবে ; তারা এখন মজুত বা 'রিজার্ভ' আছে। শ্যামে একটি বিমান বাহিনীও গঠিত হয়েছে, এতেও প্রায় আড়াই হাজার লোক নিযুক্ত। এদেশটির নৌ-বাহিনীও আছে। যুদ্ধ-জাহাজ জাপান ও ইটালী থেকে কিনে নিচ্ছে। টর্পেডো, ডেষ্ট্রয়ার, সাবমেরিন প্রভৃতি মিলে প্রায় চল্লিশ খানা জাহাজ এর আছে। ভারতবর্ষের নৌ-বহরের কথা আগেই তোমরা জেনেছ। এর তুলনায় আমাদের আয়োজন কতই সামান্য! শ্যামের দেশ-রক্ষার আয়োজন ক্রমে বেড়েই চলেছে। কিন্তু

তুরস্ক
সিরিয়া
মিশর
ইরাণ
আরব
চীন
নেপাল
ভারতবর্ষ
ইথোপিয়া
শ্যাম
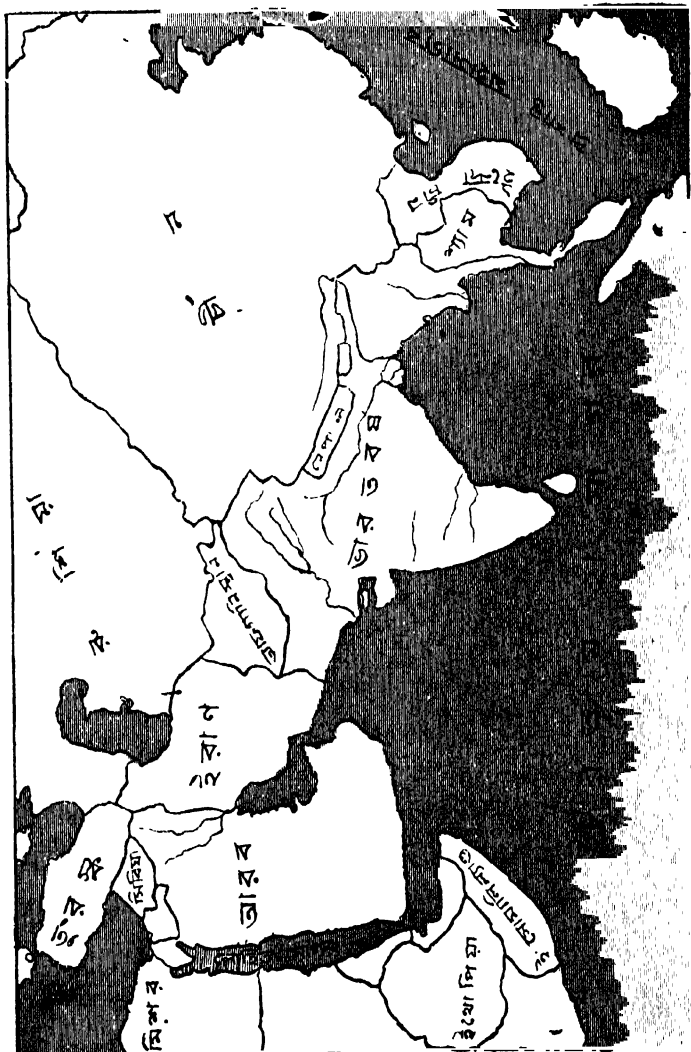
আজকালকার বিরাট শক্তির সম্মুখে একাকী পেরে ওঠা বড়ই কঠিন। তাই শ্যাম তার পররাষ্ট্র-নীতি একটি বিশেষ ধারায় চালাতে বাধ্য হয়েছে।

বিদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? শ্যামের প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী কখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কখনও বা একযোগে পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাখ্যা করে থাকেন। সম্প্রতি তাঁরা বলেছেন, শ্যামদেশ হবে এশিয়ার 'সুইজারল্যাণ্ড'। ইউরোপে অত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু এর ভেতর সুইজারল্যাণ্ডের নামটি কেউ-ই শোনে নি। পরে যখন শান্তি স্থাপিত হ'ল, রাষ্ট্র-সংঘ গঠিত হ'ল, তখন এর নাম শোনা গেল; কেননা বিরুদ্ধ দেশগুলির মিলন স্থল হ'ল এই সুইজারল্যাণ্ড। শ্যামের নেতারাও মনে করেন, এ দেশটি সুইজারল্যাণ্ডের মতই নিরপেক্ষ থেকে এশিয়ায় শান্তির পতাকা বইতে থাকবে। এজন্য নূতন শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিদেশীদের সঙ্গে তার সম্পর্কেরও রদ-বদল হয়েছে। কোন রাষ্ট্রকে বিশেষ খাতির করতে আর সে চাইছে না। ১৯৩৬ সালের পর থেকে সকলের সঙ্গেই নূতন করে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা কর্‌ছে। অনেকের ধারণা, শ্যামের শাসনকর্ত্তারা মুখে যাই বলুন, এ দেশটি আস্তে আস্তে জাপানের আওতার মধ্যেই এসে পড়বে। শ্যামের দেশ-রক্ষা মন্ত্রী কর্ণেল লুয়াং বিপুল সংগ্রাম মুসোলিনীর ফাসিজমে বিশ্বাসী। জাপানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনে

তিনি উৎসুক। তোমরা মানচিত্রে দেখেছ ব্রহ্মদেশের নীচুতে একটা সরু ফালি বরাবর দক্ষিণদিকে চলে গেছে। এর শেষ প্রান্তে রয়েছে সিঙাপুর। মাঝখানে খানিকটা শ্যামের অধীন, বাকী সবটাই ইংরেজের। শ্যামের অধীন ঐ জায়গাটার সব চেয়ে সরু অংশকে 'ক্রা' যোজক বলে। এই যোজকটি মাত্র তেত্রিশ মাইল লম্বা। আমেরিকার পানামা খাল কেটে যেমন অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যোগসাধন করা হয়েছে, এ যোজকটিতেও খাল কেটে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে যোগ স্থাপন করার প্রস্তাব চলেছে অনেক দিন থেকে। এরূপ হলে তুদিকে যাতায়াতের সুবিধা হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে যাবে, শ্যামের উন্নতিও হবে খুব; পথও ঢের কমে যাবে। চীনের যে-কোন বন্দর ও কলকাতার ভেতর জলপথ ছ'শ ষাট মাইল কমবে, আর ব্যাঙ্কক রেঙ্গুনের পথ কমবে তের শ' মাইল! কিন্তু একটি কারণে এ প্রস্তাবে অনেকের, বিশেষ করে ইংরেজের, মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে খাল কাটা হলে সিঙাপুরের ওপর টেক্কা দিয়ে জাপান শ্যামের সাহায্যে ভারতবর্ষে সৈন্য, নৌবহর, বিমানপোত অতি সহজে পাঠাতে পারবে। ইংরেজ অজস্র টাকা ব্যয় করে ভারতমহাসাগরে ঢোকবার পথে সিঙাপুরকে যে সুরক্ষিত করেছে সবই তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে। ক্রা যোজকের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে ব্রহ্মদেশ শেষ হয়েছে সেখানে (নাম ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট)

ইংরেজ ইতিমধ্যেই একটি বিমানঘাঁটি প্রস্তুত করে রেখেছে! এই খাল কাটার প্রস্তাব নিয়ে বছর দুই আগে খুবই লেখালেখি ও বাদানুবাদ চলেছিল। কিন্তু শ্যাম-সরকার এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, জাপানের কোন সঙ্ঘকে খাল কাটবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যদি কখনো খাল কাটানোই হয়, কোন আন্তর্জাতিক কমিটি বা কোম্পানীর উপরই এর ভার দেওয়া হবে। ইদানীং জাপান, চীনের ভেতরে ও দক্ষিণে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে। তার রাজ্য ক্ষুধা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্যামে যদি তার প্রভাব বেড়ে যায় তা'হলে ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্ত সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। এ সময় শ্যাম নিরপেক্ষ দেশ বলে ঘোষণা করায় সকলেই আশ্বস্ত হয়েছে। শ্যামের পররাষ্ট্র-নীতি চালনা করবার ভার যাঁর উপর, তিনি একজন একনিষ্ঠ গণতন্ত্রী,—পররাজ্য হরণ বা তাতে সাহায্য দান তাঁর কল্পনায়ও আসে না। তাঁর নাম লুয়াং প্রদিৎ মনুধর্ম্ম।

—দুই—

আফগানিস্তান

ভারতবর্ষের পূব সীমায় যেমন শ্যাম ও চীন, পশ্চিম সীমায় তেমনি আফগানিস্তান ও ইরাণ। তোমরা কলকাতার অলিগলিতে, এমন কি পল্লীর পথে ঘাটেও ঢের কাব্‌লিওয়ালা দেখ্‌তে পাও। এরা আফগানিস্তান থেকে এসেছে টাকা রোজগারের জন্য। কাব্‌লিওয়ালা কথাটিই যেন লোকের প্রাণে আতঙ্ক জন্মায়। এরা বড়ই সুদখোর; যারা এদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে, তারা ধার শোধ দিতে নাস্তা-নাবুদ হয়ে যায়। সুদখোর আর অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন বলে কাব্‌লিওয়ালারা আমাদের কাছে মোটেই শ্রদ্ধা বা সম্মান পায় না। তবে এরাও কিন্তু একটা স্বাধীন জাত, ছোট বড় সকল স্বাধীন দেশের মতই এরা নিজেরাই এদের দেশ শাসন করে থাকে। বিদেশীদের কোন কারসাজী এখানে চলে না। আফগানিস্তানে এদের বাস। এদেশটি আজকের দিনে নানা দিকে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। ভারত-সীমান্তে বলে এর কথাও আমাদের একটু বিশদভাবে জেনে নিতে হবে।

কাব্‌লিওয়ালা নামটি এসেছে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে। তবে তোমরা যাদের দেখ্‌তে পাও সকলই যে কাবুল থেকে এসেছে তা নয়, আফগানিস্তানের নানা জায়গা

থেকেই এরা এসেছে। এরা জাতিতে আফগান বা পাঠান, আর এ নাম থেকেই হয়েছে দেশটির নাম আফগানিস্তান। ভারতবর্ষের সঙ্গে এ দেশটীর যোগ বহু দিনের। মোগল আমলে এ ভারতের অধীন হয়। হিন্দু সভ্যতাও এখানে একদিন প্রসার লাভ করেছিল। এর নিদর্শন গান্ধার প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তর রয়েছে। এ জাতটি বড়ই স্বাধীনতাপ্রিয়। মোগল যুগে ভারতবর্ষের অধীনে এরা বেশী দিন থাকে নি। ইংরেজরাও এখানে বিশেষ মাথা গলাতে পারেনি। তারা কিন্তু একে নিজ তাঁবে রাখ্‌তে চেয়েছিল অন্য ভাবে। অন্য কোন বিদেশীর সঙ্গে এর বিশেষ মাখামাখি যাতে না হয় এই ছিল তাদের লক্ষ্য। এক কথায় আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতি তারাই পরিচালিত করতে চেষ্টা করত। আগেকার দিনে ইংরেজের ভয় ছিল যে, আফগানিস্তানের পথে রুশ এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে। এজন্য তারা ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল আরও বেশী করে। তারা আফগান-সরকারকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা করে খাজনাও দিত!

আফগানরা গত যুদ্ধের পর পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে মুক্ত হতে চেয়েছিল। আমীর আমানুল্লা এজন্য ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধও করেছিলেন। এর পরে ১৯১৯ সালে আফগানিস্তান ও ব্রিটেনের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাতে আমানুল্লা খুবই সুবিধা করে নিলেন। তখন রুশিয়ায় বিপ্লব দেখা দিয়েছে,

আফগানিস্তানের পথে তার ভারতবর্ষ আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। একারণ তার বৈদেশিক নীতিতে স্বাতন্ত্র্য, ইংরেজ স্বীকার করে নিলে। আমানুল্লা ইংরেজের নিকট হতে বার্ষিক খাজনা নেওয়াও বন্ধ করে দিলেন। আফগানিস্তানের শাসনকর্ত্তাকে আগে 'আমীর' বলা হত, আমানুল্লা এ সময় থেকে 'রাজা' বা শাহ্ উপাধি গ্রহণ করলেন। আফগানিস্তান ইংরেজের প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে চল্‌তে সুরু করে।

আমানুল্লা বৈদেশিক নীতিতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে নিজ ইচ্ছামত চল্‌তে আরম্ভ করলেন। যে রুশ ছিল এতকাল ইংরেজের পক্ষে জুজু, তার সঙ্গেই তিনি একটি বন্ধুত্বমূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন! রুশ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের এখন আর ভয় নেই। কিন্তু ইংরেজের আশঙ্কা হ'ল, রুশিয়ায় যে সাম্যবাদ চালু হয়েছে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে ভারতে তা আমদানী হয়ে না পড়ে। রুশ প্রভাব ওখানে যতই বাড়তে লাগ্‌ল, ইংরেজও ততই হুসিয়ার হয়ে চল্‌ল। আমানুল্লা এর পর পারস্য (এখন ইরাণ) ও তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করলেন। তুরস্কের কামালপাশা ও পারস্যের রেজা শাহ্ পহ্লভী নিজ নিজ দেশের উন্নতির জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করেছেন তিনিও তার কিছু কিছু এখানে প্রবর্ত্তন করতে চাইলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা নানা বিষয়েও সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করলেন।

নারীর অবরোধ প্রথা তুলে দিয়ে, শিক্ষা লাভের জন্য আফগান যুবক যুবতীদের বিদেশে—ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠালেন। রাণী সুরাইয়া (ভুল করে বলা হয় 'সৌরিয়া') প্রকাশ্যে বার হতেও লজ্জিত হলেন না। স্বদেশে এই সব নূতন ব্যবস্থা চালু করে পত্নীকে নিয়ে আমানুল্লা ইউরোপ ভ্রমণে বার হলেন। রোম, প্যারিস, লণ্ডন, বার্লিন সর্ব্বত্র তিনি বিপুল সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা পেলেন। কিন্তু এই ইউরোপ ভ্রমণই তাঁর কাল হ'ল। আমানুল্লা এক বৎসর কাল মাত্র বিদেশে ছিলেন। এই সময় গোঁড়া মোল্লা মৌলভীরা আফগানিস্তানের সর্ব্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার সুরু করে দিল। কোন বিদেশী শক্তি (অনেকের মতে ইংরেজ) এদের টাকা জোগান দিয়ে ও পত্রপত্রী ছাপিয়ে সাহায্য করেছিল। আমানুল্লা আফগানিস্তানে পৌঁছতেই বিদ্রোহ সুরু হ'ল। তিনি শত চেষ্টা করেও বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। অবশেষে ১৯২৯ সালে পত্নীকে সঙ্গে করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। বোম্বাইয়ে তিনি শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গান্ধীজীর কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেছিলেন! এখন তিনি ইটালীর একটি নিভৃত পল্লীতে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করছেন।

বাচ্চাই সাক্কা নামে এক ভিস্তিওয়ালা কাবুলের রাজসিংহাসনে বসেছিল কয়েকদিন। ইতিমধ্যে নাদির খাঁ

নামে রাজপরিবারের এক ব্যক্তি প্যারিস হতে তাড়াতাড়ি চলে এলেন বিদ্রোহীদের কবল থেকে আফগানিস্তানকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য। তিনি একজন কুশলী যোদ্ধা। সকলেই ভেবেছিল, বিদ্রোহ দমন করে তিনি আবার আমানুল্লাকে দেশে ফিরিয়ে আন্‌বেন। একটি বিষয়ে নাদির খাঁর ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন দেখা গেল। ইংরেজ এক কোটি টাকা আর দশ হাজার রাইফেল বন্দুক দিয়ে তাঁকে বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করল! বিদ্রোহও শীঘ্র দমন করা হ'ল। কিন্তু আমানুল্লাকে ডেকে না এনে তিনিই সিংহাসনে বস্‌লেন, নাম নিলেন নাদির শাহ্! ইংরেজ যে তাঁকে সাহায্য করেছিল তার বোধ হয় এই সর্ত্ত ছিল যে, আমানুল্লাকে আর দেশে ফিরিয়ে আনা চলবে না। অবশ্য অনেকে এরূপ সন্দেহ করেন।

আমানুল্লা দেশে যে সব সংস্কার প্রবর্ত্তন করতে চেয়েছিলেন, নাদির শাহ্‌ও তাই বাহাল কর্‌লেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকে নাদিরের আইনগুলি এক বাক্যে মেনে নিলে! এর রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। তবে আমানুল্লার মত সাত তাড়াতাড়ি তিনি কিছু করেন নি। তিনি মূলে হাত দিলেন। লোকে যাতে এ সব রাজার হুকুম মনে না করে নিজেদেরই কর্ত্তব্য বলে গ্রহণ করে তিনি তাঁর ব্যবস্থা করলেন। দেশে একটি নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হ'ল। সরকারী বিভিন্ন বিভাগ মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। একটি জাতীয়

পরিষদ, সেনেট ও জীর্গা গঠন করা হ'ল। সেনেটের সদস্য হলেন পঁয়তাল্লিশ জন, তাঁরা জীবনভর সদস্য থাকবেন। জাতীয় পরিষদের সভ্য হলেন এক শ' চারজন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেশবাসীর ভোটে এঁরা নির্ব্বাচিত হন। সাধারণতঃ মে মাস হতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এর অধিবেশন বসে। রাজসংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত না হলে জীর্গা ডাকা হয় না। প্রায় চার বছর অন্তর অন্তর একে ডাকবার কথা। এত করেও কিন্তু নাদির শাহ্ দেশবাসী সকলের মন পেলেন না। এক দল লোক বিশ্বাস করত যে, নাদির শাহ্ আমানুল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। একদিন একটী সভায় বক্তৃতা করবার সময় তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন (১৯৩৪সাল)। এর পরে নাদির শাহের পুত্র মহম্মদ জাহির শাহ্ উনিশ বছর বয়সে আফগানিস্তানের রাজা হলেন। নাদিরের ভ্রাতা তাঁর প্রধান উপদেষ্টা। এঁদের সমবেত চেষ্টায় আফগানিস্তানে আর বিদ্রোহ হতে পারল না। জাহির শাহের এখন বয়স পঁচিশ বছর। যুবকের প্রগতিশীল দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেশ শাসন করছেন। পিতার উদার শাসন নীতি তিনি অনুসরণ করে চলেছেন অবিরত। রাষ্ট্রের নানা বিভাগে তিনি বিদেশী উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছেন। ইটালী, জার্ম্মাণী, জাপান এই তিনটি দেশের প্রভাব এখানে বেশী পড়ছে। ভবিষ্যতে ইংরেজের সঙ্গে এদের যুদ্ধ বাধলে আফগানিস্তানকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ

আক্রমণ করতেও পারবে! জাহির সৈন্য বিভাগে জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছেন। কাবুলে একটি যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিমানপোত ব্যবহার করতেও লোকেরা শিখ্ছে। আমানুল্লার সময় রুশীয় মালের কাট্‌তি আফগানিস্তানে বেড়ে যায়, আজকাল জাপানী মাল খুব কাট্‌ছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, জাপানী মালে ওদেশ ছেয়ে গেছে। আবার কৃষি বিভাগ, সেচ বিভাগ, শিল্প বিভাগেও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য খুবই নেওয়া হচ্ছে। আফগানিস্তানে খনিজ দ্রব্য বিস্তর আছে, কিন্তু এযাবৎ তা উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়নি। জাপানীদের সাহায্যে তা আহরণের চেষ্টা চল্‌ছে। শিক্ষা, শিল্প ও দেশ-রক্ষা এ তিনটি বিষয়ের উন্নতিতে জাহির শাহ্ বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। তিনি ১৯৩৭ সালে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন কালে তাঁর নীতি এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন,—

"আমাদের করতে এখনও অনেক কিছু বাকী আছে। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, আজ অন্যান্য অগ্রসর জাতি যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি লাভ করেছে আমরা যেদিন সেরূপ উন্নতি লাভ করব,তাদের মত সম্পৎশালী এবং স্বদেশ রক্ষার জন্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হতে পারব সেদিন আমাদের সত্যিকার উন্নতি হয়েছে বলে গর্ব্ব করা চলবে। এসকল বিষয় বিবেচনা করে গবর্ণমেণ্ট বছরের আরম্ভেই বার্ষিক বজেটে শিক্ষা, শিল্প ও সৈন্য বিভাগের খাতে বেশী পরিমাণ টাকার বরাদ্দ করেছেন।"

এ বছরের বজেটে সৈন্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে ৭,১৬,৪৪,০০০ আফগানি টাকা। আফগানিস্তানের সৈন্যসংখ্যা কত জান? বাট হাজার। এখানে ডাক, তার, বেতার, রেডিও প্রভৃতি নানা বিভাগ খোলা হয়েছে। এখানে কিন্তু রেলপথ নেই। তবে দিকে দিকে এখন মোটর রাস্তা তৈরি হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিও হয়েছে খুব। এদেশে বিস্তর ফল জন্মে। কাব্‌লি মটর, কাব্‌লি বেদানা—তোমরা তো অনবরত শুন্‌ছ। এ ছাড়া বাদাম, পেস্তা, আঙুর প্রভৃতি নানারকম ফলও সেখান থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়। এসব ব্যবসা ভারতবাসীর হাতে অনেকটা রয়েছে। এ থেকেই আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। আফগান ও ব্রিটিশদের ভেতরই এ পর্য্যন্ত সম্পর্ক নির্ণয় চলেছে। ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি বলে নিজস্ব কোন নীতি নেই। ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতিই ভারতের বৈদেশিক নীতি বলে গণ্য হয়ে থাকে। এখন কিন্তু এর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভারতবাসীর সঙ্গে আফগানীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় প্রতিবেশী হয়েও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হতে পারে নি। আফগানদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য। এই অজ্ঞতার জন্য, আর প্রীতি স্থাপন না হবার ফলে ভারতবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশেষ ব্যাঘাত ঘট্‌ছে। অন্যে এদের তুচ্ছ বা ঘৃণা করলেও ভারতবাসী

তা করতে পারবে না। আফগানিস্তানের বৈদেশিক নীতি এখন ঢেলে সাজা হচ্ছে। রুশিয়ার দিকে এর আর দৃষ্টি নেই। তুরস্ক, ইরাক ও ইরাণের সঙ্গে এ বিশেষ সন্ধিতে আবদ্ধ। ইটালী, জার্ম্মাণী, জাপানও এর সঙ্গে নানা চুক্তি করে এখানে আড্ডা গাড়তে চাইছে। এর কিছু আভাসও তোমরা পেয়েছ। এবার কিন্তু ইংরেজ এসম্বন্ধে টুঁ শব্দটীও করছে না। কিন্তু ভারতবাসীর এতে ভাববার কারণ আছে যথেষ্ট।

—তিন—

ইরাণ

এর সঙ্গেই ইরাণ বা পারস্যের কথা এসে পড়ে। ইরাণও আমাদের নিকট-প্রতিবেশী। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পরই যেমন আফগানিস্তান, বালুচিস্তানের পরই তেমনি ইরাণ। এদেশ কখনও ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অথচ এদের ভেতরে সম্পর্ক বহু দিনের পুরাতন। জাতি হিসাবেও ভারতবাসী ও ইরাণীর ভেতর বেশ একটা যোগাযোগ রয়েছে। অতীত যুগে মধ্যএশিয়া থেকে আর্য্যদের এক শাখা এসেছিল ভারতে, আর এক শাখা গিয়েছিল এই ইরাণ দেশে। মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হবার আগে এরা ছিল অগ্নি উপাসক। আমাদের দেশে যে-সব

পার্শী রয়েছে তারা প্রাচীন ইরাণীদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি পুরাপুরি বজায় রেখেছে। ধর্ম্মে মুসলমান হলেও ইরাণীরা নিজ বৈশিষ্ট্য কিন্তু একেবারে হারায় নি। তাদের ধর্ম্মও একটা বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে এখানে। মুসলমান ধর্ম্মের সুফী-বাদের যদিও জন্ম হয় আরবে, এখানে কিন্তু তা প্রসার•লাভ করে। ইরাণীরা সিয়া মুসলমান। মোগল যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে এদের খুবই যোগাযোগ ঘটে। কিন্তু আজ এই ইংরেজ আমলে তারা যেন কতই না দূরের বলে বোধ হচ্ছে। আজ লণ্ডন, প্যারিস আমাদের খুবই কাছে মনে হয় তেহেরাণের চেয়ে। কেন এমনটি হয় আফগানিস্তানের বেলায় সে কথা আমি তোমাদের বলেছি।

ইরাণ বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে সমান তালেই চলেছে। ইরাণ কথাটির চল হয়েছে আজকাল। আগে 'পারস্য' নামেই এদেশ অভিহিত হত। পারস্য—এদেশটির একটি ছোট জেলার নাম। বর্ত্তমান রাজা রেজা শাহ্ পহ্লভী গত ১৯৩৫ সালে এর নাম বদলে ইরাণ করে দিয়েছেন। দেশের নাম অত ছোট জায়গার নামে হবে কেন? ইরাণ বল্‌তে বোঝায়—তুর্কী থেকে আফগানিস্তান পর্য্যন্ত ভূখণ্ড! আগেকার পারস্য সাম্রাজ্য এতটা জুড়েই ছিল। রেজা শাহ্ জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির খুবই পক্ষপাতী। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে বলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও যে হারাতে হবে এমন কোন কথা

নেই। তাই তিনি প্রাচীন অনেক কিছুই বাহাল করেছেন। পহ্লভীর দেওয়া ঐ নাম সকলেই মেনে নিয়েছে। ইতিহাস, ভূগোলে আজ এই নাম দেখ্‌বে। ভাষার নামও আর 'ফার্শি' নেই, 'ইরাণী' হয়েছে। এই একটি ব্যাপার থেকেই, রেজা শাহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তোমরা বুঝতে পার। এখন ইরাণ কারো তাঁবেদার নয়, সবল সুস্থ একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র।

১৯১৯ সাল ইরাণের পক্ষে বড়ই খারাপ বছর। ইউরোপে লড়াই থেমে গেল বটে, কিন্তু এখানে বিদেশীর উপদ্রব কমল না। ইংরেজ শাহ্‌কে দিয়ে এ বছরে একটা হীন সন্ধি করে নিলেন। ইংরেজের প্রভাব সমস্ত ইরাণের উপর ছড়িয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। ওদিকে উত্তর সীমানায় রুশ বিপ্লবীরা একটা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করলে।

রেজা শাহ্ জাতিতে কসাক। উত্তর ইরাণের সেনা দলে তিনি একজন সামান্য সৈনিকের কাজ করতেন। রুশ বিপ্লবীদের বাধা দিতে গিয়ে তিনি হেরে যান। জাতির এই দুর্দ্দিনে রেজা মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে রাজধানী তেহেরানের দিকে ছুটলেন, গবর্ণমেণ্ট হাত করবার জন্য। দেশের দুর্দ্দশা দেখে তিনি এতই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। সকল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সরে দাঁড়ালেন। রেজা সুলতানকে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা গঠন করিয়ে নিলেন। তিনি নিজে হলেন প্রধান সেনাপতি। ১৯২১ সালে এসব ঘটল। ইরাণের জনসাধারণ ছিল ছিন্ন

বিচ্ছিন্ন, নিজেদের স্বার্থ অনেকেই জাতির স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখ্‌ত। রেজা দিকে দিকে সৈন্য পাঠিয়ে দুর্দ্দান্ত, স্বার্থপর, জাতিদ্বেষী সবাইকেই দমন করলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁর স্বজাতি প্রেমের ছোঁয়াচ ইরাণী জনসাধারণের মনে গিয়ে লাগ্‌ল। সকলেই জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য এক হয়ে দাঁড়াল। ইংরেজের সঙ্গে যে সন্ধি হয়েছিল তা তিনি নাকচ করলেন। রুশ বিপ্লবীদেরও তিনি তাড়িয়ে দিলেন।

ইরাণের শাহ্‌ ছিলেন নামকাওয়াস্তে রাজা, বিলাসের পঙ্কেই ডুবে থাক্‌তেন। তিনি এ সময়ে গেলেন বিদেশে। তাঁর উপরে বালক বৃদ্ধ সকলেই চটা। যিনি স্বদেশকে এক সময় পরের হাতে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর উপর কে সন্তুষ্ট থাক্‌বে বল? রেজা শাহের তখনকার নাম রেজা খাঁ। তিনি ইতিপূর্ব্বেই শাহের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। এঁর বিদেশ গমনের সুযোগ নিয়ে তিনি গণ-পরিষদ আহ্বান করলেন। এই গণ-পরিষদ কথাটির ইংরেজী নাম 'কনষ্টিটিউয়েণ্ট এ্যাসেম্বলী'। এ কথাটি আজকাল তোমরা কংগ্রেসের কোন কোন প্রস্তাবে দেখ্‌তে পাও। এর অর্থ—জাতির সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধি নিয়ে একটা বিরাট সম্মেলন। বিশেষ কোন সঙ্কটের সময়ে, বা বিশেষ কোন ব্যাপারে জাতির মত নিতে হলে এইরূপ গণ-পরিষদ আহ্বান করা হয়। ইরাণে তখন ভীষণ সমস্যা

উপস্থিত,—রাজা কে হবেন ! আগে সেই ১৯০৬ সালে এখানে বিলাতী পার্লামেন্টের অনুকরণে 'মজলিস' গঠিত হয়েছিল। শাহের মন্ত্রীসভাকে শাসন ব্যাপারে এর মতামত নিয়ে চল্‌তে হত। রেজা খাঁ এর সাহায্যেই গণ-পরিষদ আহ্বান করলেন। জনমত তখন তাঁকেই চাইছে। তাই গণ-পরিষদ তাঁকে এক বাক্যে ইরাণের রাজা বলে মেনে নিলে। রেজা খাঁ নাম নিলেন রেজা শাহ্ পহ্লভী। পূর্ব্ব সুলতান বিদেশে থাক্‌তেই খবর পেলেন তিনি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। এর পরেই ইরাণের নূতন জীবন সুরু হ'ল।

আগেই তো লোকে রেজা খাঁর নামে ভয়ে কাঁপত। এখন রেজা শাহ্ ইরাণের রাজা,—জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। এখন যে লোকে তাঁকে সমীহ করে চল্‌বে তা আর বল্‌তে ? রেজা শাহ্ আগেই উত্তর ইরাণ থেকে রুশিয়াকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ যে দক্ষিণ ইরাণে একেবারে জেঁকে বসেছে। কি করে তাদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা যায় এর পরে এ-ই হ'ল তাঁর চিন্তা। 'ক্যাপিটুলেশন' কথাটির মানে আগে তোমাদের বলেছি। ইরাণেও বিদেশীদের আয়ত্তাধীন অঞ্চলগুলি তাদের ইচ্ছামতই শাসিত হত। রেজা শাহ্ বল্‌লেন, তা হবে না। ইরাণের সর্ব্বত্রই গবর্ণমেন্টের শাসন চালাতে হবে। রেজা শাহের যে কথা সেই কাজ। বিদেশীদের ওজর-আপত্তি কিছুই টিকল না। তিনি ক্যাপিটুলেশন তুলে দিলেন।

বিদেশীর প্রভাব মুক্ত হতে হলে ইরাণের রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য হওয়া দরকার। তিনি একে অবিলম্বে সংঘের সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত করালেন।

বহুদিন ধরে রুশ ও ইংরেজ ইরাণকে নিজ আওতার মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছিল। রেজা শাহ্ চতুর রাজনীতিক। একের বিরুদ্ধে অন্যকে খেলিয়ে তিনি নিজ শক্তি দৃঢ় করে নিয়েছেন। রুশের ইচ্ছা ইরাণের উত্তর সীমা হতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত রেলপথ তৈরী হোক, আর ইংরেজ চায় বাগদাদ থেকে তেহেরাণ পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করতে, তা'হলে ইরাণ হতে তেল চালান দেওয়া তার পক্ষে সুবিধা হবে। ইরাণের এই তেল আহরণের কাহিণী পরে বলছি। রেজা শাহ্ কাউকেই 'না' বলে অসন্তুষ্ট করলেন না। তিনি উভয়েরই সাহায্য নিয়ে উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর তীর থেকে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত রেল লাইন তৈরী করালেন। কিন্তু এমন অখ্যাত অগম্য জায়গায় এর আরম্ভ ও শেষ হয়েছে যে, এতে উত্তর দিক থেকে রুশেরও কোন সুবিধা হ'ল না, আবার দক্ষিণ দিকে ইংরেজও এর দ্বারা উপকৃত হ'ল না। ইংরেজের আওতা থেকে শেষের স্থানটি অনেক দূরে! রেজা শাহ্ একটি বিষয়ে খুবই হুসিয়ার। তিনি কারুর কাছ থেকে টাকা ধার করেন নি। এ রেল লাইন হাজার মাইল লম্বা, আর এতে টাকা খরচ হয়েছে কম করে হলেও পনর কোটি!

রেল লাইন সুবিস্তৃত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। দেশ ক্রমশঃ সম্পৎশালী হচ্ছে। এখানে আর একটি কথা বলে রাখ্‌ছি। ইরাণ আয়তনে বাংলা-বিহার-আসামের তিন গুণ। কিন্তু লোকসংখ্যা এই তিনটি প্রদেশের ছ' ভাগের এক ভাগ, মাত্র দেড় কোটি! তবে এর অর্দ্ধেকটাই মরুভূমি। এখানে শস্য যা' জন্মে তাতে অধিবাসীদের ভরণপোষণ বেশ চলে। আগে চলাচলের সুবিধা ছিল না। এজন্য দেশের একদিকে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য হলেও অন্যদিকে তার অভাব ঘট্‌ত খুবই, ফলে প্রায়ই কোন না কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হত। এখন রেলপথ স্থাপিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ একরূপ হয় না বল্‌লেই চলে। ইরাণীদের খাদ্য গমের আটা। এখানে ফলমূলও হয় বিস্তর, তাও এরা খায়, আবার বিদেশে চালানও দেয়।

ইরাণের খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রধান হ'ল তেলের খনি। জগতে যে-সব দেশ তেলের খনিতে সমৃদ্ধ, তাদের ভেতরে এ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বহুদিন পূর্ব্বে ১৯০১ সালে উইলিয়াম নক্স ডার্সি নামক এক ইংরেজ ইরাণের তেলের খনি অঞ্চলগুলি ষাট বছরের জন্যে ইজারা নেয়। ইরাণের পাঁচ ভাগের চার ভাগের উপরই ছিল এই ইজারা! তখন রাজসরকারকে লাভের শতকরা ষোল ভাগ দেবে বলে ঠিক হয়েছিল। রাজস্বের্র চার ভাগের এক ভাগ হ'ল এই খাজনার

পরিমাণ। কিছু বলা নেই কওয়া নেই, রেজা শাহ্ ১৯৩২ সালে একদিন এই ইজারা বাতিল করে দিলেন! এতদিন লোকে তাঁর শক্তি বুঝতে পারে নি। এবারে বুঝলে তাঁর শক্তি কত। ইংরেজ রাষ্ট্র-সংঘে নালিশ করলে। সংঘ এই মীমাংসা কর্‌লেন যে, সরকারে আরও বেশী খাজনা দিতে হবে। ইরাণের অতখানি জুড়েও আর ইজারা চল্‌ল না, আগেকার জায়গার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণই কমিয়ে দেওয়া হ'ল! রেজা এরূপই চেয়েছিলেন। তিনি ইরাণকে রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য কেন করিয়েছিলেন এবারে তাও বেশ বুঝা গেল।

এ থেকে রেজা শাহের পররাষ্ট্র বা বৈদেশিক নীতির কথাও এসে পড়ে। যে রাষ্ট্র পররাষ্ট্র-নীতিতে যত কৌশলী সে রাষ্ট্র তত শীঘ্র উন্নতিলাভ কর্‌তে পারে। ইরাণ রেজা শাহের কর্ত্তৃত্বে এসেছে আজ পনর বছরও হয়নি। এর ভেতরই এ যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হতে পেরেছে তার কারণ পররাষ্ট্র-নীতিতে রেজা শাহের অদ্ভুত দক্ষতা। তিনি স্বদেশকে রুশ ও ইংরেজের কবলমুক্ত করেছেন, অথচ এদের সঙ্গে মিত্রতাও বজায় রেখেছেন। প্রাচ্যের মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও আফগানিস্তান যেন এক সূত্রে গাঁথা ক'টি ফুল। ইটালী, জার্ম্মাণী, জাপান যে কিরূপ শক্তিশালী হয়ে চলেছে রেজা শাহ্ তাও লক্ষ্য করতে ভুলেন নি! এদের

সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখনও স্পষ্ট রূপ নিয়েছে বলে মনে হয় না। ইদানীং জানা গেছে, জার্ম্মাণীর প্রভাব ইরাণেও কিছু কিছু পড়্ছে।।

রেজা শাহ্ পহ্লভীকে অনেকে কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাস্তবিক আতাতুর্কের মতই তিনি দেশের চেহারা বদলে দিয়েছেন। তুরস্কের সকল কার্য্যে যেমন ধর্ম্মকে বাদ দেওয়া হয়েছে, রেজা শাহ্ কিন্তু তা হতে দেননি। তবে দেশের উন্নতির জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই তিনি বাহাল রেখেছেন। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এসকল বিষয়ে সংস্কার সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও মোটামুটি শরিয়ৎ অনুসারেই এ সকল সম্পন্ন হয়। ফৌজদারী, দেওয়ানী আইন, উন্নত দেশগুলির আদর্শেই রচিত হয়েছে। আগে লোকশিক্ষার ভার ছিল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। একে তিনি এখন সম্পূর্ণভাবে রাজসরকারের হাতে এনেছেন। নারী শিক্ষার বন্দোবস্ত তিনি করেছেন, নারীর স্বাধীন চলাফেরায় এখন আর কোন বাধা নেই। এতে গোঁড়াদের ওজর-আপত্তি কিছুই টেঁকে নি। রাণী বিনা অবগুণ্ঠনে প্রকাশ্য রাজপথে বার হয়ে থাকেন। বিজ্ঞানের নূতন নূতন বিষয়গুলিও সবই ইরাণে চালু হয়েছে। বেতার, বিদ্যুৎ, রেডিও, মোটর গাড়ী আজ সেখানে নূতন জিনিষ নয়। রেজা শাহ্ মধ্যযুগীয় জমীদারী প্রথা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। এখন প্রজা-সাধারণ জমির

মালিক। রেজা শাহ্ প্রচুর সোণা সঞ্চয় করেছিলেন। তা সবই জাতির উদ্দেশে দান করেছেন।

দেশ-রক্ষার উপায়ও তিনি করেছেন। আজকাল চারদিকে রণবাদ্য বেজে উঠেছে। দেশ-রক্ষার জন্যে সকলেই আজ ব্যাকুল। তিনিও সাধ্যমত সৈন্য সংগ্রহ করে রেখেছেন। ইরাণে প্রত্যেককেই জীবনের কিছু সময় যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় কাটাতে হয়। সেখানে মাইনে করা সৈন্য রয়েছে সত্তর হাজার। নৌ-বাহিনী এর তেমন নেই। যে ক'খানি যুদ্ধ জাহাজ আছে সবই ইটালীতে তৈরী। এর বিমানপোত কিছু রয়েছে, সংখ্যা অনুমান দু'শ। ইরাণের উপর দিয়ে ব্রিটিশ ও জার্মান বিমানপোত চল্‌বার অনুমতি প্রথমে দেওয়া হয়েছিল। এখন তা বাতিল করা হয়েছে! কেন, কেউ তা বল্‌তে পারে না। মাত্র ওলন্দাজ বিমানপোত এখন ইরাণের আকাশ-পথে যাতায়াত করতে পারে। তবে এদেরও নাকি প্রত্যেক দু'মাস অন্তর সরকারের অনুমতি নিতে হচ্ছে এর জন্য!

ইরাণ থেকে আমরা বেদুইনের দেশ আরবে এসে পড়েছি। সাধারণের কাছে আরব এখনও একটি রহস্যপূর্ণ দেশ। তোমরা 'আরব্য উপন্যাস'-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছ, কেউ কেউ পড়েছও হয়ত। বহু চমকপ্রদ কাহিনী যেন একে রহস্যের আবরণে ঢেকে রেখেছে। আরবদের বাস্তবরূপও কম চমকপ্রদ নয়। তারাও আজ যুগধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে সুরু করেছে।

ইরাণ দেশের কাছে ইরাক। এই ইরাক থেকে মিশর পর্য্যন্ত আরবদের বসতি। প্রাচীনকালে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত ছিল আরবরা, তুৰ্দ্ধর্ষও ছিল খুবই। তারা রোম-সাম্রাজ্যের নিকট কখনই একেবারে মস্তক বিলিয়ে দেয় নি। আরবের উত্তরদিকে ভূমধ্যসাগর তীরে কতকটা ফালির মত জায়গা অধিকার করেই রোমকদের সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়েছিল। পরে মহম্মদের আবির্ভাবের সঙ্গে আরবেরা নূতন প্রেরণা লাভ করে, তারা দিকে দিকে ইস্‌লামের বার্ত্তা প্রচারও সুরু করে দেয়। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র পশ্চিম, দক্ষিণ ও মধ্যএশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ ইউরোপ ও সুদূর স্পেন পর্য্যন্ত ইসলাম ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়ে। তুর্কীরা এশিয়া

মাইনরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারাও ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলে এবং নবোদ্যমে রাজ্য বিস্তারে মন দিলে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদের কনষ্ট্যান্টিনোপল্ অধিকার ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। আরবভূমিও ক্রমে শক্তিমান তুর্কী-সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে যায়।

আরবরা কিন্তু স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের মতই প্রাণ দিয়ে ভাল-বাসে। তুর্কীসাম্রাজ্যের অধীন হলেও তারা তাদের স্বাধীন চিত্তবৃত্তি কখনো হারায় নি। আরবের দূরদূরান্তে তুর্কী শাসন কখন চালুও হয় নি। এর ভেতরে জগতে শিল্প, বাণিজ্য, শাসন প্রভৃতি বিষয়ে যুগান্তর এসে গেল। আরবরা গৃহ-হারা যাযাবর বেদুইন বলে ঘৃণিত হলেও এ সবের ঢেউ তাদের ভেতরেও এসে পৌঁছল। তুর্কী কিন্তু রইল পেছনে পড়ে। পুরাতনকে আঁকড়ে থাক্‌তে গিয়ে আগেকার শক্তিও সে হারাল। বিগত ১৯০৮ সালে তুরস্কে শাসন-ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্ত্তন হয়। আরবরাও দাবি করলে দেশ-শাসনে তাদেরও অধিকার দিতে হবে। তারা খানিকটা পেলও, কিন্তু তাতে তারা মোটেই খুশী হতে পারে নি। এ সময়ে তুর্কীর পরিবর্ত্তে আরবী ভাষাই আরবে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হয়। আরবদের তুর্কী বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে অনেক আগে থেকে ইংরেজ ও ফরাসীরা আরবে আড্ডা গাড়তে আরম্ভ করে। ১৯০৮ সালের পর হতে তাদের প্রচারকার্য্য আরও জোর চল্‌তে থাকে।

এর পর মহাসমর বাধল। তুরস্ক যোগ দিলে জার্ম্মাণীর সঙ্গে। এদিকে জার্ম্মাণ বিরোধী ইংরেজ ও ফরাসীরা কেমন করে আরবদের হাত করে ফেলেছে তুর্কীরা তা বুঝতেই পারলে না। ১৯১৮ সালে তুর্কী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে আরব থেকে চিরতরে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। আরবরা কিন্তু মিত্র-শক্তিদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল মাত্র একটি সর্ত্তে। তুরস্কের অধীনতা-পাশ মুক্ত করে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে কর্ণেল টি, ই, লরেঞ্চ নামক একজন ইংরেজের কথা তোমাদের বলে রাখ্ছি। তুর্কীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আরবদের যাঁরা উত্তেজিত করেছিলেন তাঁদের ভেতরে এঁর কৃতিত্ব সব চেয়ে বেশী। তিনিও আরবদের ঐ সর্ত্তটি মেনে নিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর কিন্তু আরবদের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করা হ'ল। আরবের উত্তর অংশকে ইরাক (আগেকার নাম মেসোপটেমিয়া), সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এই তিনটি ইংরেজ ও ফরাসীর ম্যাণ্ডেট বা শাসনাধীন রাজ্যে পরিণত করা হয়! মক্কার আমীর হুসেনকে দক্ষিণ আরবের আর তাঁর এক পুত্রকে প্যালেষ্টাইন সংলগ্ন ট্রান্সজর্ডানের রাজা করা হ'ল! আবার, প্যালেষ্টাইনকে একটা ইহুদী-আবাসে পরিণত করাও ঠিক হ'ল। সমগ্র আরবে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠ্ল। লরেঞ্চ দেখ্লেন তাঁর প্রতিশ্রুতি কিছুই পালন হচ্ছে না। তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে, পদক পুরস্কার সব ফেরত পাঠিয়ে

পশুচারণে রত আরবের যাযাবর বেদুইন

আঙ্কারার জাতিতত্ত্ব মন্দিরে কামালের অশ্বারোহী মূর্ত্তি
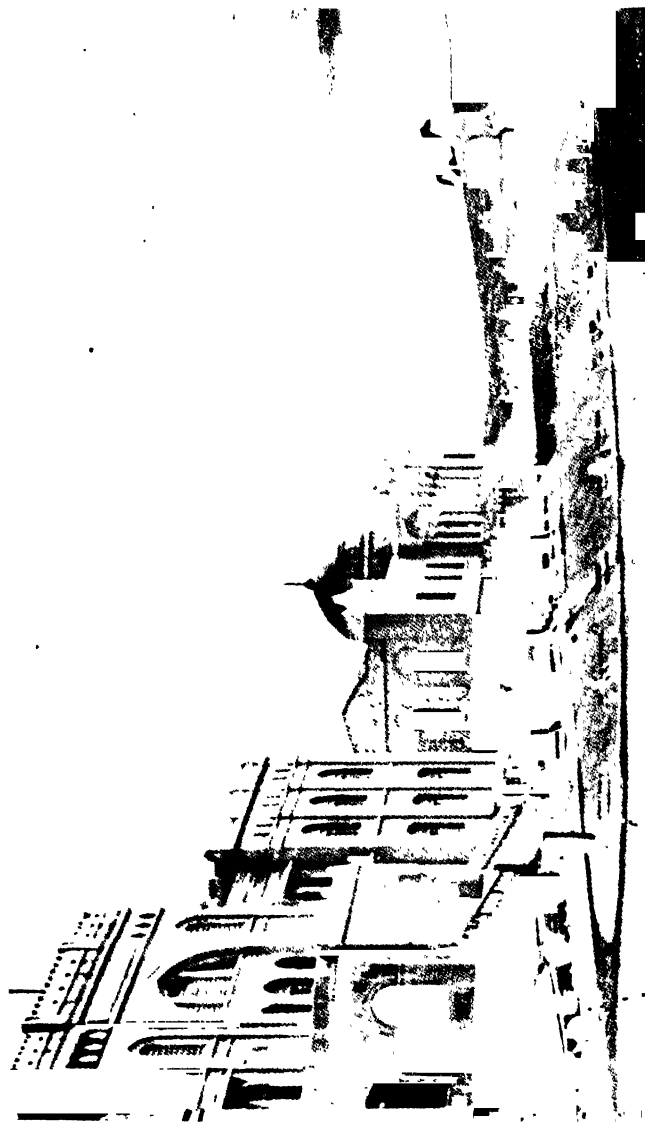
ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তিনি নিজেও কিন্তু একজন ইংরেজ!

আরবদের খুশী করবার জন্য এর পরে কিছু কিছু চেষ্টা হয়। ইরাকের উপর থেকে ইংরেজ খবরদারি তুলে নিল। আমীর হুসেনের এক পুত্র আমীর ফয়জলের অধীনে একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হ'ল। আমীর হুসেন পয়গম্বরের বংশধর বলে পরিচিত হলেও তাঁর উপর আরবদের বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন বিলাসী ও অসদাচারী। দক্ষিণ-মধ্য আরবে ওয়াহাবি নামে এক গোঁড়া আরব সম্প্রদায় ছিল, এখনও আছে। তারা কোরাণের প্রতিটি আদেশ মান্য করে চলে, এজন্য সাধারণ লোকের নিকট তারা খুবই সম্মান পেয়ে থাকে। এই দলের নেতা ইব্‌ন্ সৌদ আমীর হুসেনকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। তিনি বিস্তর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে মক্কায় হাজির হলেন। আমীর হুসেন বিনা আপত্তিতেই সরে দাঁড়ালেন। ইব্‌ন্ সৌদ আরবের রাজা হলেন। ইংরেজ এতে উচ্চবাচ্য করে নি। বরং তলে তলে ইব্‌ন্ সৌদকে সাহায্যই করেছিল। এডেনের উত্তর-পশ্চিমে ইমেন নামে আর একটি আরব রাজ্য আছে। এটিও স্বাধীন রাষ্ট্র। উত্তরে সিরিয়ায় প্রথম কয়েক বছর দাঙ্গাহাঙ্গামা খুবই চলেছিল। সম্প্রতি ফ্রান্স তাকে খানিকটা স্বাধীনতা দিবে বলে অঙ্গীকার করেছে। প্যালেষ্টাইনের হাঙ্গামা অনেক দিন থেকেই চলছে। এর মীমাংসার জন্যে এখন পর্য্যন্ত তেমন

কোন ব্যবস্থা হয়নি। তবে বর্ত্তমানে লণ্ডনে আরব, ইহুদী ও ব্রিটিশদের ভেতর আলাপ-আলোচনা চল্‌ছে। ইংরেজ এবার প্যালেষ্টাইনকেও একটি আরব রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে হয়ত বাধ্য হবে। এ বিষয় পরে তোমরা জান্‌বে।

বল্‌তে গেলে ইব্‌ন্ সৌদই আরবের পুরোপুরি স্বাধীন রাজা। তাঁর আমলেই আরবে নব যুগের সূচনা হয়েছে। তিনি ওয়াহাবি দলের নেতা ছিলেন বটে, কিন্তু এখন তিনি গোড়ামি অনেকটা বর্জ্জন করেছেন। মরুময় আরবভূমিতে রেলপথ ও মোটর রাস্তা নির্ম্মিত হয়েছে। যাযাবর উপজাতি-গুলি তাঁর শাসনাধীনে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে সুরু করেছে। ছেলেমেয়েদের আধুনিক রীতিতে শিক্ষাদান ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হয়েছে। গীতবাদ্য গোঁড়া মুসলমানদের নিকট পাপের বস্তু। ইব্‌ন্ সৌদ কিন্তু এর জন্যও বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বর্ত্তমান যুগের উপযোগী সকল রকম সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হননি। মোটর, মোটর লরী, বাস, রেল, রেডিও প্রভৃতির সঙ্গে বেদুইনরা খুবই পরিচিত। ডাক বিভাগ, তার ও বেতার বিভাগ খোলা হয়েছে। আমোদ-প্রমোদেরও আয়োজন আছে প্রচুর।

হঠাৎ এত সুখসুবিধা ভোগের সুযোগ ঘটলেও আসল কথাটি কিন্তু তারা ভোলে নি। তারা স্বাধীন। স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে শক্তি বাড়ান যে আবশ্যক একথা, তারা বেশ

জানে। এজন্য ইব্‌ন্ সৌদ আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে আরবদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেছেন। আরবরা সেকালের ছোরা তলোয়ার ছেড়ে কামান বন্দুক চালনা করতে আরম্ভ করেছে। বিমানপোতের ব্যবহারও তারা শিখ্‌ছে।

এতদিন আরবভূমি বিশেষ করে ইংরেজেরই আওতায় রয়েছিল। ইব্‌ন্ সৌদ দেখ্‌লেন কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের আওতায় থাক্‌লে তার ষোল আনা পরিপুষ্টি লাভের সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি ইংরেজের নিকট থেকে যতখানি সুবিধা আদায় করা যায় তা করে নিয়েও অন্যের সঙ্গেও নানারূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছেন। আবিসিনিয়া বিজয়ের পর ভূমধ্য সাগরে ও লোহিত সাগরে ইটালীর ক্ষমতা বেড়ে গেছে। এজন্য ইব্‌ন্ সৌদ ইটালীর সঙ্গেও কিছু বোঝাপড়া করে নিয়েছেন। ইমেনেরও ইটালী বন্ধু। এখন ইংরেজ চট করে আরবের উপর কোন হুমকী চালাতে ভরসা পাবে না। প্যালেষ্টাইন থেকে সুরু করে সমগ্র আরব ভূমিতে ইটালী ও জার্ম্মানী ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার কার্য্য অনেক দিন যাবৎ চালিয়েছে, এখনও জার্ম্মানী নাকি চালাচ্ছে, আরবদের ব্রিটিশ বিদ্বেষের সুযোগ নিয়ে। আরবরা কিন্তু খুবই চতুর। নানা জনের ঘাড়ে চেপে নিজ কার্য্য হাসিল করতে এদের বোধ হয় জুড়ি নেই। এরা তা করেও নিচ্ছে। আবার এদের জেদও খুব। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে সমগ্র আরব

ভূমিরই এক মত। একে একটি আরব রাষ্ট্র বলে স্বীকার না করিয়ে ওরা ছাড়বে না।

আরব প্রসঙ্গে মিশরের কথাও এসে পড়ে। মিশরের সভ্যতা বহু প্রাচীন। তার প্রাচীন ম্যমির ছবি তোমাদের নিশ্চয়ই বিস্ময় জাগাবে। এ-ও তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন হয়েছিল; গত মহাসমরের আরম্ভ অবধিই এরা অধীন ছিল। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ইংরেজই কিন্তু এর বুকের উপর কর্তৃত্ব করেছে। সুয়েজ খাল কাটানোই হয়েছিল মিশরের পক্ষে কাল। মিশর এর জন্য খুব ঋণগ্রস্ত হয়। ইংরেজ টাকা ধার দিয়ে মিশরকে ঋণমুক্ত করল, অংশগুলিও নিজেই কিনে নিল। মিশরের উপর তার কর্তৃত্ব এই সময় থেকেই সুরু হয়। গত ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ যখন বাধল তখন ইংরেজ মুখোস খুলে ফেল্লে। মিশর ব্রিটিশ রাজ্য বলে ঘোষিত হ'ল! যুদ্ধ শেষে তার দশা আরবের মতই শোচনীয় হয়েছিল। স্বাধীনতা দূরে থাকুক, কোন ক্ষমতা মিশরবাসী পেলে না। তখন মিশরে জোর আন্দোলন চলে। জগলুল পাশা ছিলেন এ আন্দোলনের প্রধান হোতা। তিনি বহুবার দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছেন, বহুবার কারাবরণও করেছেন। কিন্তু মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলন কখনও থামে নি। ইদানীং কিন্তু এর বরাত ফিরে গেছে। ইটালী আবিসিনিয়া জয় করায় তার প্রভাব ভূমধ্যসাগরে ও উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় খুবই বেড়ে গিয়েছে।

কাজেই ইংরেজের পক্ষে মিশরকে বিদ্বিষ্ট করে রাখা সম্ভব হয়নি। গত ১৯৩৬ সালে ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে একটি চুক্তি সাধিত হয়। তাতে মিশরের স্বাধীনতা মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে। দেশ-রক্ষা ব্যাপারেও তার কর্ত্তৃত্ব এখন স্বীকৃত। তবে আলেকজাণ্ড্রিয়া, সুয়েজখাল প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ইংরেজের ঘাঁটি থাক্‌বে। মিশরের পশ্চিম সীমায় রয়েছে ইটালীর লিবিয়া, দক্ষিণে আবিসিনিয়া। কাজেই এতে তার সুবিধাই হয়েছে।

সুয়েজ খালের কথা তোমাদের বলেছি। এ অঞ্চলটি মিশরের অধীন। কিন্তু যে কোম্পানী এই খাল কাটায় তাকে এ অঞ্চল এক শ' বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৯৬৯ সালে ইজারার মেয়াদ শেষ হবে। দ্য লেসেপ্‌স্‌ নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এই খাল কাটার ব্যবস্থা করেন। খালটি একশ' তিন মাইল লম্বা। এ খাল কাটতে ঢের অর্থব্যয় হয়েছিল। আগে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আস্‌তে হলে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আস্‌তে হত। সুয়েজ খাল কাটাবার পর পথ অনেকটা সোজা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির দিক দিয়ে এর গুরুত্ব খুবই বেড়ে গেছে।

আরব প্রসঙ্গে তুরস্কেরও উল্লেখ করা হয়েছে। যার একদিন অতটা বিশাল সাম্রাজ্য ছিল তার এখন কি অবস্থা? তোমরা হূন, তাতার প্রভৃতি নাম শুনেছ। তুর্কীরাও এ রকম একটি জাত। মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্তান তাদের আদি বাসস্থান। সেখান থেকে তারা এশিয়া মাইনরে এসে বসবাস আরম্ভ করে। এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই তারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তারা নবীন উদ্যমে রাজ্য বিস্তার করতে থাকে। রোমের পূর্ব্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল তুর্কীরা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে দখল করে, আগে বলেছি। বলকান উপদ্বীপ, আরব, মিশর, এমনকি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকারও খানিকটা দখল করে ফেলে। কিন্তু তারা ছিল প্রাচীনপন্থী। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল তখন তারা পুরাতনকেই আক্‌ড়ে থাক্‌তে চেয়েছিল। ইউরোপ-বাসীরা তুর্কীকে তাই ইউরোপের 'রুগ্ন মনুষ্য' নাম দিয়েছিল। গত পঞ্চাশ বছরের ভেতর তুর্কীর নানা দুর্গ্রাবিপর্য্যয়

ঘটেছে। বলকান উপদ্বীপের সবটাই সে একে একে হারায়। মিশর, নামে মাত্র তার অধীন থাকে। আরব অধীন থেকেও নানা ভাবে তাকে নাজেহাল করতে লাগ্‌ল। গত মহাযুদ্ধের শেষে তার সাম্রাজ্য ত সে হারালই, উপরন্তু তার অস্তিত্বও লোপ পাবার উপক্রম হ'ল। ইংরেজ, ফরাসী, ইটালীয়ান, গ্রীক সকলে মিলে তাকে ভাগবাট্‌রা করে নিতে চাইলে। কামাল-পাশার (পরে, কামাল আতাতুর্ক) নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি তুরস্ককে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেন। সাম্রাজ্য তিনি চান নি। ইউরোপ ও এশিয়ার যে অংশটুকুতে তুর্কীদের বাস শুধু সেইটুকুতেই একটি স্বাধীন রিপাব্লিক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এতে তিনি বাধা পেয়েছিলেন ঢের। তাঁকে অনেক যুদ্ধবিগ্রহও করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকলকেই নব্য তুর্কীকে মেনে নিতে হয়। ১৯২৩ সালের লজান সন্ধিতে তুরস্কের স্বাধীনতা স্বীকৃত হ'ল।

এর পরই আরম্ভ হ'ল তুরস্কের নূতন যুগ। সুলতানকে আগেই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছিলেন খলিফা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি। মুসলমান জগতে তিনি খলিফা বলে সম্মান পেতেন। কামাল এ পদটি তুলে দিয়ে সুলতান ও তাঁর বংশীয়দের ক্ষমতার শেষ সূত্রটুকুও উচ্ছেদ করলেন। তুরস্ক একটি গণতন্ত্রে পরিণত হ'ল। কামাল হলেন প্রেসিডেন্ট। তুরস্কের পার্লামেন্টের নাম নেশ্যন্যাল এসেম্বলী। এর ভেতর

থেকে সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানে একাধিক দল নেই, একটি দলই বরাবর দেশ শাসন করছে। মাঝে একবার কামাল একটি বিরুদ্ধ দল গড়বার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন দেশের উন্নতির পক্ষে তারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তখন এ দল তুলে দিলেন। গত নবেম্বর মাসে কামাল মারা গিয়েছেন। তাঁর স্থলে যিনি প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন তাঁর নাম ইশ্‌মেত ইনোনু। তিনি কামালের যোগ্য সহচর। গত ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মিত্রশক্তির ছল চাতুরী ভেদ করে তুরস্ককে মুক্ত করতে তাঁর চেষ্টা কামালের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। তিনি কর্ণধার হওয়ায় এদেশ আরও উন্নতির দিকেই চলবে।

যে-সব কারণে তুর্কীজাতি সভ্য জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে বাধা পাচ্ছিল কামাল রাষ্ট্রের ভার নিয়ে একে একে তা সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই তুর্কীজাতির প্রাণে একটা নূতন চেতনার সঞ্চার করলেন। তাঁর সংস্কারকার্য্য মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ধর্ম্ম, সমাজ ও অর্থনীতি। ধর্ম্মগত কুসংস্কার দেহ মনে মানুষকে যতটা পঙ্গু করে রাখে এমনটি আর কিছুতেই করতে পারে না। তিনি প্রথমেই খিলাফৎ উচ্ছেদ করলেন। কিছুদিন মুসলমান

ধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম হিসেবে রেখেছিলেন, শেষে তাও তুলে দিলেন। মোল্লা মৌলবীদের প্রভাব থেকে শিক্ষা সংস্কৃতিকে মুক্তি দিলেন। মস্‌জিদ বা ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করলেন। তুর্কীদের ভেতরও সনাতনপন্থী গোঁড়া লোক ঢের ছিল। তারা আপত্তিও করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি কামালের হস্তে। তিনি অবিলম্বে সব বিরোধিতা থামিয়ে দিলেন। সামাজিক ব্যাপারে তিনি যে-সব পরিবর্ত্তন ঘটালেন তা শুনলে তোমরা আশ্চর্য্য হবে। পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিসের উপরই তিনি নজর দিলেন। তুর্কী পুরুষরা স্মরণাতীত কাল থেকে ফেজ পরে আস্‌ছে, আর নারীরা পরেছে বোর্‌খা। তিনি দুই-ই তুলে দিলেন আইন করে। এর ব্যতিক্রম হলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হতে হয়। এ ব্যাপারে কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল! কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই কামাল সব দমন করলেন। তিনি নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। নারী ভোট দেবার ক্ষমতা পেয়েছে। রাষ্ট্রের উচ্চ-নীচ সকল রকম কাজে সে পুরুষের সহযোগিতা কর্‌ছে। স্কুল-কলেজের দ্বার তার নিকট আজ মুক্ত। কামাল দেশের আইন-কানুনও বর্ত্তমান আদর্শে তৈরী করে নিয়েছেন। এখন আর কাজির বিচার সেখানে চলে না। শিক্ষা সম্পর্কেও নূতন ধারা অনুসৃত হয়েছে সেখানে। কামালের ধারণা

আরব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আওতায় থেকে তুর্কীদের অতটা অধঃপতন হয়েছিল। তিনি আরবির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্য আরবি হরফ বদ্‌লে রোমান হরফ প্রবর্ত্তন করলেন। এখন তুরস্কে শিক্ষা সম্পর্কীয় সকল কিছুই রোমান হরফে হয়। আগে প্রত্যেকের নামের শেষে, 'বে' 'পাশা' প্রভৃতি যোগ করে দেওয়া হত। কামাল এ-ও তুলে দিয়েছেন। প্রত্যেকের নামের সঙ্গে কোন কৌলিক বা পারিবারিক উপাধি যোগ করে দেওয়া স্থির হয়েছে। কামাল পাশা হয়েছিলেন কামাল আতাতুর্ক (তুর্কীর জনক), বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট ইশ্‌মেত পাশা হয়েছেন ইশ্‌মেত ইনোনু।

ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন ঘটান হয়েছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। কিন্তু সকল উন্নতির মূলেই যে রয়েছে অর্থ। অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে? বিদেশ থেকে অর্থ ঋণ করে অনেকে স্বাধীনতা হারিয়েছে। একারণ বিদেশীর টাকা গ্রহণে ইরাণ ও শ্যাম বরাবর ইতস্তত করেছে। কামাল একজন কূট রাজনীতিক! বিদেশীরা অর্থ দাদন দিয়ে আগে যে সব সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন (যেমন, ক্যাপিটুলেশ্যন প্রথা) সে সব তো তিনি তুলে দিলেনই, নূতন করে এমন সব সর্ত্তে তিনি টাকা ধার করলেন যাতে বিদেশীরা তাঁর কোন কাজে টুঁ শব্দ করতে পারলে না। তাদের প্রভাবমুক্ত হয়েই তিনি টাকা ধার করেছেন বরাবর। তোমাদের এর একটি উদাহরণ

দিচ্ছি। গত ১৯৩৪ সালে দেশের শিল্পোন্নতির জন্য এক পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হয়। রুশিয়ায়ও এর আগে এরূপ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে। তাই কামাল রুশ-বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করে কাজ আরম্ভ করে দিলেন—টাকাও এল রুশিয়া থেকে। কিন্তু গত ১৯৩৬ সালে স্পেন-বিপ্লবের সময় ঈজিয়ান সাগরে ইটালীর সাবমেরিণ যখন রুশ জাহাজ ডুবিয়ে দিচ্ছিল তখন রুশিয়া তুরস্কের নিকট সাহায্য চায়। কামাল দেশের স্বার্থের কথা ভেবে এতে রাজি হতে পারেন নি। আজ ব্রিটিশ, জার্ম্মান, মার্কিন, রুশ—নানা জাতের টাকাই তুরস্কের শিল্প কারখানায় খাট্‌ছে। তুরস্কের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রায় শেষ হতে চলেছে। এর ফলে কৃষিকর্ম্মে যন্ত্রপাতীর ব্যবহার সর্ব্বত্র সুরু হয়েছে। বস্ত্র, ইস্পাত, কাগজ, কাচ, চিনি, ঔষধ, যন্ত্র প্রভৃতি শিল্পে তুর্কী এখন খুব উন্নত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে—প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়ের শত করা আশীভাগ সেখানে উৎপন্ন হয়, আর যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সবটাই সে এখন মেটাতে পারে। তুরস্কে জার্ম্মাণীর ব্যবসা খুবই বেড়ে গেছে। তার বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা চল্লিশ ভাগই আজ জার্ম্মাণীর হাতে, এতে ব্রিটেনের স্থান এখন তৃতীয়।

আজ ইউরোপের আকাশে অশান্তির কাল মেঘ দেখা দিয়েছে। সকলেই আজ একটা ভীষণ অনর্থের আশঙ্কা কর্‌ছে,

কখন কোথায় লড়াই বাধবে ঠিক নেই। আর তুরস্ক হ'ল ইউরোপের ফটক। তুরস্ককে কোন ইউরোপীয় শক্তিই কখনো পছন্দ করে নি। তাকে হাত করে নিজ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছে কিন্তু অনেকেই। ইংরেজ, ফরাসী, ইটালীয়ান, জার্ম্মাণ, রুশ প্রত্যেক বড় বড় শক্তিরই স্বার্থ রয়েছে এখানে। বলকান রাষ্ট্রগুলির কাঁচা মাল আহরণ, দার্দ্দেনেলিস প্রণালী দিয়ে স্বাধীনভাবে গমনাগমন, ইরাকের তেলের খনির উপর আধিপত্য বিস্তার, সুয়েজ খালে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন প্রভৃতি নানা ব্যাপারেই তুরস্কের সঙ্গে খাতির করে তাদের চল্‌তে হত; কোন কোন ব্যাপারে এখনও তাকে তোয়াজ করতে হয়। তুরস্ক ছোট বড়, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে বহু রাষ্ট্রের সঙ্গেই সন্ধি স্থাপন করেছে। এ বিষয়ে এর জুড়ি আর একটি রাষ্ট্রেরও নাম করা যায় না। কামালের নীতিই ছিল এই। ইরাক, ইরাণ ও আফগানিস্তান এই তিনটি মুসলমান রাষ্ট্রের সঙ্গেও তুরস্ক সন্ধিবদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু নানা দেশের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হলেই তো আর সোয়াস্তি পাওয়া যায় না। আবিসিনিয়া ও ইটালীর ভেতরে সন্ধি বলবৎ থাক্‌তেই তো একে অন্যের ঘাড় মট্‌কে দিয়েছে! কাজেই নিজ শক্তি না বাড়াতে পারলে চুক্তি বা সন্ধি, কিছুতেই কিছু ফল হয় না। কূটনীতি দ্বারা যতটুকু সম্ভব তা কামাল আদায় করে নিতে কখনও পশ্চাৎপদ হননি।

দার্দ্দেনেলিস ও বস্‌ফরাস প্রণালী যুদ্ধের পর অরক্ষিত অঞ্চল ব'লে গণ্য হয়, অথচ এগুলি তুরস্কেরই মধ্যে। আর শত্রুর আক্রমণ ব্যাহত করতে হ'লে এদের সুরক্ষিত করা তার পক্ষে একান্তই দরকার। গত ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসে হিটলার জোর করে জার্ম্মাণীর ঐরূপ একটি অঞ্চল রাইনল্যাণ্ড দখল করেন। এ বিষয় তোমাদের পরে বল্‌ব। কামালের এতে বেশ সুবিধা হ'ল। তিনি রাষ্ট্র-সংঘের কাছে ঐ দুটির কর্ত্তৃত্ব ভার চাইলেন। মঁন্ত্রো শহরে সভা হ'ল। তিনি বিনা আয়াসেই দার্দ্দেনেলিস ও বস্‌ফরাস্ রক্ষার ভার পেয়ে গেলেন! এক সময় যারা তুরস্কের অধীন ছিল বা শত্রু ছিল তাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছেন। বলকান উপদ্বীপে যে রাজ্যগুলি আছে তাদের এক কথায় বলা হয় বলকান রাষ্ট্র। এরা মিলে যে বন্ধুত্বমূলক চুক্তি করেছে তার নাম বলকান আঁতাত। তুরস্ক, গ্রীস, য়ুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা নানা কাজ; মিলে মিশে করে। সম্প্রতি প্রকাশ, এরা দেশ-রক্ষা ব্যাপারেও একত্র হয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছে। এরা নাকি মতলব করেছে, পাঁচ বছরের ভেতর আশী লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করবে!

তুরস্ক কিন্তু আত্মরক্ষা ব্যাপারে নিজ দায়িত্বের কথা মোটেই ভোলেনি। অবস্থিতি হিসাবে তার গুরুত্ব অনেকখানি। ইউরোপে যুদ্ধ বাধলে কোন না কোন পক্ষে তাকে যোগ দিতেই

হবে। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী প্রত্যেকটির দিকেই সে দৃষ্টি দিচ্ছে। ইউরোপের সকল দেশই যেন পাল্লা দিয়ে সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে চলেছে। তুরস্কও সরকারীভাবে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য পোষণ করে; যুদ্ধ-বিমানপোতও তার হাজারের কাছাকাছি। তবে বিমানপোত আরও বাড়াবার কথা চল্ছে। নৌবহরে—ক্রুজার, সাবমেরিণ, ডেষ্ট্রয়ার প্রভৃতি মিলে প্রায় ত্রিশখানা জাহাজ আছে। এইভাবে আত্মরক্ষার আয়োজন খুবই চলেছে। যুদ্ধ শেষে এশিয়া-মাইনর শাসনের ভার ইটালীকে দেওয়া হয়েছিল। তুরস্কের উপর ইটালীর লোভ অনেক দিন ধরেই। সে তুরস্কের কাছ থেকে ত্রিপলী কেড়ে নেয় ১৯১১-১২ সালে। সেই থেকেই ইটালীর উপর তুরস্কের ঘোর বিতৃষ্ণা। সে এই বিতৃষ্ণার ভাব এখনও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি। নিকটবর্ত্তী ডোডেকানিজ দ্বীপেও ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলিতে ইটালীর ঘাঁটি স্থাপন তার আশঙ্কা অত্যন্ত বাড়িয়েই দিয়েছে।

পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মাণীর রাজ্য লিপ্সা ইদানীং খুবই বেড়ে গেছে। তুরস্ক জার্ম্মাণীর কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য নিচ্ছে বটে, কিন্তু ঐ কারণে আর ইটালীর সঙ্গে জার্ম্মাণীর ঘনিষ্ঠ আঁতাত থাকায় সে-ও যেন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভাবী মহাসমরে সে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবে ঠিক করতে পারছে না।

—এক—
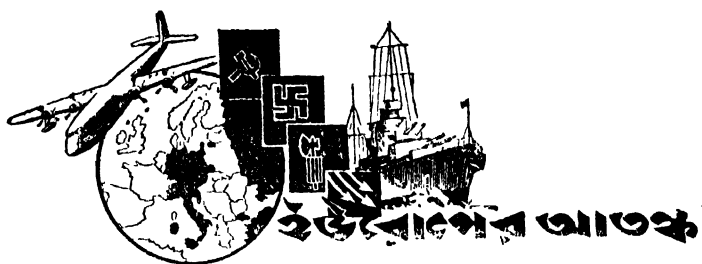
ভের্সাই সন্ধি

এ পর্য্যন্ত তোমরা যে-সব দেশের কথা শুনেছ, তাদের সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কথাও এসে পড়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবে জগতে পাঁচ-ছ'টি মহাদেশ আছে, তাদের ভেতর শুধু ইউরোপের কথাই কেন এসে পড়ল। এযুগে ইউরোপই জ্ঞান-বিজ্ঞানে অন্য সব দেশের শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। এমন একদিন ছিল যখন ভারতবর্ষ, চীন, মিশর, আসিরিয়া সভ্যতায় অন্য সব দেশের সেরা ছিল। তখন এদের প্রভাবও জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আজ চাকা ঘুরে গেছে। ভারতবর্ষকে 'সভ্য' করতে ইংরেজ এদেশে এসেছে! চীনকে 'সভ্য' করবার জন্য ইউরোপ আমেরিকার নানা জাতি সেখানে হানা দিয়েছে অনেক দিন ধরে।

জগৎ কোন্ পথে

সমস্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্য্যাস নিয়ে ইউরোপে যে সভ্যতার উদয় হয়েছে তার দুই মূর্ত্তি আমরা লক্ষ্য করেছি—একটি ধ্বংস-মূর্ত্তি, আর একটি কল্যাণ-মূর্ত্তি। কল্যাণ-মূর্ত্তির চেয়ে ধ্বংস-মূর্ত্তির সঙ্গেই সকলে বেশী পরিচিত। অন্য দেশ জয় করতে বা অধীন রাখ্‌তে এই মূর্ত্তিরই বিশেষ প্রয়োজন। জগতে আজ যে দ্বন্দ্ব, কলহ, যুদ্ধ দেখা দিয়েছে তা এই মূর্ত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। আগেকার যুগেও দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হ'ত। কিন্তু তখন ধ্বংসলীলা এত বহু-ব্যাপক ছিল না। অথবা, ধ্বংস ও কল্যাণ একই জিনিষ থেকে উদ্ভূত না হওয়ায় সাধারণের চোখে এ বৈষম্য তেমন করে ধরা দিত না। তোমরা এরোপ্লেন নিশ্চয়ই দেখেছ। এরোপ্লেনের প্রচলনে লোকে আজ খুবই উপকৃত। দু' দিনের পথ এখন দু' ঘণ্টায় যাওয়া যায়! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এতে করে বহু গ্রাম জনপদ ধ্বংস করারও ব্যবস্থা হয়েছে। উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে কত নরনারী, কত অমূল্য সম্পদই না এ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করা হয়েছে! এজন্য ইউরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

আমরা তুরস্ক থেকে ইউরোপে এখন প্রবেশ করব। কাজেই ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে আগে থেকেই কিছু জ্ঞান থাকা ভাল। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ বুঝতে

মস্কো
সোভিয়েট রুশিয়া
জার্মানী
পোলাণ্ড
ফ্রান্স
হাঙ্গারী
রুমানীয়া
যুগোশ্লাভিয়া
স্পেন
মরোক্কো
তুরস্ক
লিবিয়া
মিশর
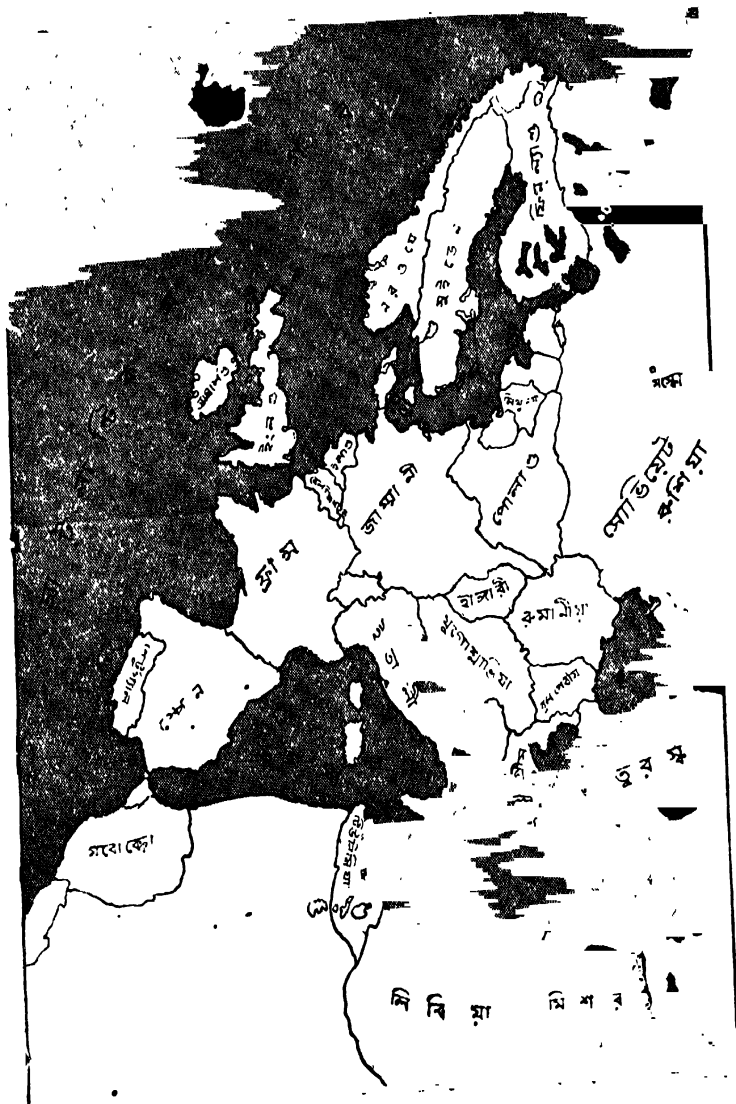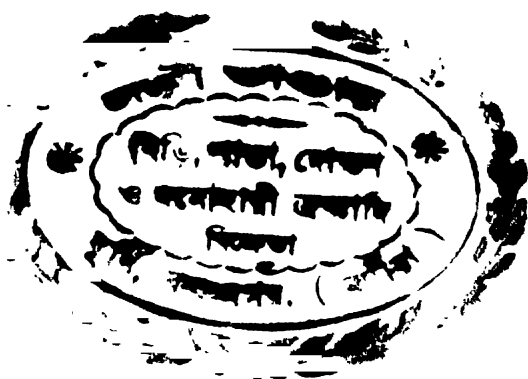
হলে আরও কোন কোন বিষয় তোমাদের জানতে হবে। ইউরোপ একটা মহাদেশ হলেও আয়তনে তেমন বড় নয়। ভারতবর্ষের আয়তন যতখানি, রুশিয়াকে বাদ দিলে এর আয়তনও ঠিক ততখানি হবে। কিন্তু এর ভেতরেই অন্যূন পঁচিশটি স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে! কোন কোন মনীষী বলেছেন, ইউরোপে আজ যত গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে তার মূলে রয়েছে এতটুকু জায়গায় অতগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের অবস্থিতি। পরস্পরের ভেতর দ্বন্দ্ব, কলহ, রেষারেষি এজন্য খুবই বেড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা তোমাদের জানা দরকার। জগতের মানচিত্র প্রায়ই বদলে যায়, কিন্তু ইউরোপের মানচিত্রই বদল হচ্ছে বেশী দ্রুত। বিভিন্ন দেশের সীমানা আজ যেমন দেখ্‌ছ বিশ বছর পরে সেরকম আর থাকবে না। আবার বিশ বছর আগেকার মানচিত্রের সঙ্গে যদি তুলনা করে দেখ, তাহলেও দেখ্‌বে অনেক পরিবর্ত্তন। তবে গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের মানচিত্রে যতটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে, আগে এমনটি খুব কমই দেখা গিয়েছে। গত যুদ্ধের পূর্ব্বের ও পরের মানচিত্র তুলনা করলেই তোমরা একথা বুঝতে পারবে। মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের ভের্সাই শহরে দুই পক্ষের ভেতর সন্ধি হয়। আজকের দিনের ইউরোপকে বুঝ্‌তে হলে এই সন্ধির কথা তোমাদের বিশেষ করে জেনে রাখ্‌তে হবে। কারণ এর গলদের জন্যই আজ যত রকম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

গত মহাসমরে এক পক্ষে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আর অন্য পক্ষে ছিল জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। প্রথম পক্ষকে এক কথায় বলা হত মিত্রশক্তি। রুশিয়াও প্রথমে এই দলে ছিল। কিন্তু স্বদেশে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হলে রুশেরা দল ছেড়ে চলে যায়। অন্য ছোট ছোট রাষ্ট্র অধিকাংশই মিত্র-শক্তিদের পক্ষে ছিল। যুদ্ধে জার্ম্মাণী ও তার সঙ্গীরা শেষ পর্য্যন্ত হেরে যায়। ভের্সাইয়ে তাদের মহাসমরের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী বলে সাব্যস্ত করা হ'ল। ভের্সাই সন্ধিকে তাই ঠিক সন্ধি বলা চলে না, সত্য কথা বল্‌তে গেলে একে, বিজিত পক্ষের উপর বিজয়ী মিত্র-শক্তিদের জবরদস্তিই বলতে হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন বলেছিলেন, যুদ্ধশেষে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করবে। ভের্সাই সন্ধি দ্বারা কার্য্যতঃ একথা অস্বীকার করা হ'ল। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য ছেটে ফেলে নূতন নূতন রাষ্ট্র তৈরী করা হ'ল। জার্ম্মাণী তার সমস্ত উপনিবেশই হারাল। খাস জার্ম্মাণীর কতকটা ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি কতকগুলি নূতন রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও রুশিয়া অনেক দিন আগে পোল্যাণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এবারে পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীনতা পেল। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী,

চেকোশ্লোভাকিয়া, য়ুগোশ্লাভিয়া, ডানজ্জিগ, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া এই রকম অনেকগুলি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'ল। জার্ম্মাণীর উপনিবেশ আফ্রিকা ও এশিয়া'য় ছড়ানো ছিল। ইংরেজ ও জাপান এর বেশীর ভাগ নিয়ে নিলে। জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি বিলোপেরও ব্যবস্থা হ'ল। এক লক্ষের বেশী সৈন্য সে রাখতে পারল না। নৌবহর তাঁকে সামান্যই রাখতে দেওয়া হ'ল এবং বিমান-বহর সমূলে নষ্ট করা হ'ল।।

এর পর সেভার্স সন্ধিতে তুরস্কের দেশগুলিও তার হাতছাড়া হয়ে যায়, ইউরোপ থেকে তার অস্তিত্ব লোপেরও ব্যবস্থা হয়! তুরস্ক এ ব্যবস্থার কিরূপ প্রত্যুত্তর দিয়েছে তা তোমাদের আগেই বলেছি। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরব ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বণ্টন করা হ'ল। যে সব নূতন দেশ মিত্রশক্তিরা পেল তাদের নাম দেওয়া হ'ল 'ম্যাণ্ডেট' বা ক্ষমতাধীন রাষ্ট্র! এ সব দেশ বাস্তবিকই এক একটি পরাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। এরা কি রকম অধীন হয়ে পড়েছে প্যালেষ্টাইনের দৃষ্টান্ত থেকেই তোমরা তা বুঝতে পার। কিন্তু শাসনের উপযুক্ত হলে কাউকে কাউকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে এরকম প্রস্তাবও করা হয়েছিল। ইরাক এই প্রস্তাব অনুসারে স্বাধীন হয়েছে বটে, কিন্তু ইংরেজ কেন যে তার উপর থেকে তাঁবেদারি তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ পরে জানতে পারবে।

রুশিয়া ভের্সাই সন্ধিতে আদৌ যোগদান করে নি। সেখানে তখন বিপ্লব উপস্থিত। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে সাম্যবাদ মূলক শাসন প্রবর্ত্তনে তখন রুশেরা ব্যস্ত। এই রাজ্য 'লুঠের' ব্যাপারে লাভবান হ'ল বিশেষ করে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়নগুলি, ফ্রান্স ও জাপান। ইটালী কিন্তু কিছুই পেল না। অথচ জার্ম্মাণ পক্ষ থেকে ইটালীকে ভাগিয়ে আনা হয়, যুদ্ধ শেষে তাকেও রাজ্য দেওয়া হবে এই আশা দিয়ে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্কের অস্তিত্ব লোপ করে দেবার ব্যবস্থা হওয়ায় ক্ষতিপূরণের যত চাপ সবই পড়ল জার্ম্মাণীর উপর। বহু সহস্র কোটি টাকা তাকে মিত্র-শক্তিদের দিতে হবে স্থির হয়।

প্রেসিডেণ্ট উইলসন চৌদ্দ দফা সর্ত্তে মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। তার প্রধান সর্ত্তটির কথা আগে উল্লেখ করেছি। আর একটি সর্ত্ত ছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি রাষ্ট্র-সংঘ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি যখন বুঝলেন, রাষ্ট্র-সংঘ নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তিনি ঐরূপ গ্লানিকর সন্ধিতেও স্বাক্ষর করতে দ্বিধা করলেন না! ভেবেছিলেন রাষ্ট্র-সংঘেই সব সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের কিন্তু ইউরোপীয়দের কথার উপরে তেমন আস্থা ছিল না। তারা রাষ্ট্র-সংঘে যোগ দিতে অস্বীকার করল। উইলসন এজন্য মনে খুবই আঘাত পেলেন। এর কিছুকাল পরেই তিনি মারা যান।

—দুই—

ইটালী

গত মহাযুদ্ধে ইটালী বহুলক্ষ যুবক হারিয়েছে, ততোধিক লোক বিকলাঙ্গ হয়ে ফিরেছে গৃহে, আর টাকাও খরচ হয়েছে তার অগণিত। কিন্তু ভের্সাই সন্ধিতে লুঠের মাল কিছুই সে পেলে না। ইটালীতে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হ'ল। জাতির এই বিক্ষোভ থেকেই ফাসিজ্‌মের উৎপত্তি হয়েছে, আর মুসোলিনীর নেতৃত্ব লাভও সম্ভব হয়েছে এই কারণেই। মুসোলিনী আগে ছিলেন সমাজতন্ত্রী দলের একজন চাঁই। ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের সংঘবদ্ধ করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভে তিনি এ দল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। দল হিসাবে সমাজ তন্ত্রীরা ছিল-এর ঘোর বিরোধী। যুদ্ধ শেষেও মুসোলিনীর তেমন নাম হয়নি। তিনি কিন্তু বুঝতে পারলেন, নেতাদের অক্ষমতা আর আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব কলহের দরুন বিশ্ব দরবারে ইটালীর স্থানই হবে না। সর্ব্বত্র ফাসিষ্ট দল গঠন করে মুসোলিনী ইটালীর পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলন স্বুরু করে দিলেন।

১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে মুসোলিনী শাসনভার নিজ হাতে নিলেন। তাঁর শাসন চল্‌ছে আজ ষোল বছরের কিছু

উপর। মুসোলিনীর কথা আমরা এত বেশী করে শুনছি যে, স্বতঃই আমাদের মনে হবে মুসোলিনীই বুঝি ইটালীর রাজা। তা কিন্তু তিনি নন্। ইটালীরও রাজা আছেন, তাঁর নাম ভিক্টর ইমানুয়েল। আবিসিনিয়া বিজয়ের পর থেকে তিনি সম্রাট বলেও পরিচিত হচ্ছেন। আগে ইটালীতে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় তাঁর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর ক্ষমতা এখনও এরূপ সীমাবদ্ধই আছে, কিন্তু মুসোলিনীর ক্ষমতা বেড়ে গেছে অসম্ভব রকম। কেমন করে তিনি নিজ ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছেন তা তোমাদের বলছি।

মুসোলিনী ইটালীকে পুনর্গঠিত করে, একে করে তুল্‌লেন একটি 'করপোরেটিভ ষ্টেট'। তিনি দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষামূলক কার্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে কতকগুলি 'করপোরেশন' বা সমবায়ে বিভক্ত করলেন। জমিদার প্রজা, ধনিক শ্রমিক উভয়ের প্রতিনিধি নিয়ে এই সব কমিটি গঠিত হ'ল। নিজ নিজ সীমার ভেতরে এরাই কর্ত্তা। পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদ এরাই মিটমাট করে নেয়। করপোরেশনগুলির সকলের উপরে হ'ল ষ্টেট-করপোরেশন, তার সভাপতি হলেন মুসোলিনী স্বয়ং। বিভিন্ন করপোরেশনে ফাসিষ্ট দলেরই প্রাধান্য। কাজেই জাতীয় জীবনের সমুদয় বিভাগই ধীরে ধীরে মুসোলিনীর হাতে চলে এল। তিনি পার্লামেণ্টকে একেবারেই তুলে দেননি, ক্রমে একে শক্তিহীন করে তুলেছেন। নির্ব্বাচন প্রথার আমূল

পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন করপোরেশন নিজ নিজ কেন্দ্রের সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করে ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলে পাঠায়। মুসোলিনীর অন্তরঙ্গদের নিয়েই এই ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিল গঠিত। এই সভা ঐ সব তালিকা থেকে চার শত নাম বাছাই করে নির্ব্বাচনের জন্য সাধারণের নিকট উপস্থিত করে। সাধারণে 'হাঁ' বা 'না' বলবারই শুধু অধিকারী। তারা এতে প্রায়ই সম্মতিই দিয়ে থাকে। বছরে কখনো কখনো 'পার্লামেণ্ট' ডাকা হয় বটে, কিন্তু তাদের হাতে এখন আর কোন ক্ষমতা নেই। ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলই আইন-কানুন প্রণয়ন, যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিচালন প্রভৃতি কার্য্য জাতির তরফ থেকে করে থাকে। ফাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিল মাঝে মাঝে বসে। কিন্তু মুসোলিনীর কথায়ই সায় দিয়ে চলে। সমস্ত বিরুদ্ধ মত উচ্ছেদ করে দিয়ে মুসোলিনী এইরূপে নিজের শক্তি দৃঢ় করেছেন। তিনি দেশের উন্নতিকল্পে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন তাতে অল্পকালের ভেতরেই জাতি তার হৃত শক্তি ফিরে পেল, ইটালী প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল।

ইটালীর পররাষ্ট্র-নীতি আজ বিশ্ববাসীর আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। গত যুদ্ধে বিজেতাদের দলে থেকেও সে হয়েছিল সব রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ আঘাত জাতির অন্তরতম প্রদেশে গিয়ে পৌঁছায়। মুসোলিনী জাতির এ তীব্র মনোভাবের ষোল আনা সুযোগ নিয়ে একদিকে যেমন নিজের শক্তি দৃঢ়

করলেন, অন্য দিকে তেমনি জাতির পররাষ্ট্র-নীতিও নূতন করে গঠন করতে সুরু করলেন। তিনি ১৯২৫ সালে ইংরেজকে দিয়ে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়ে নিলেন যে, ভের্সাই সন্ধির সময় ইটালীর কথায় কর্ণপাত না করায় মিত্রশক্তিদের পক্ষে তার প্রতি ঘোরতর অন্যায়ই করা হয়েছে।

এই অন্যায় প্রতিকারের পূর্ব্বে ইউরোপে নিজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ফ্রান্স মধ্য ইউরোপে তার ক্ষমতা বিস্তার করছিল এই সময়ে। ইটালীর তা মোটেই ভাল লাগেনি। অথচ তার এমন শক্তি ছিল না যে, সে তাকে বাধা দেয়। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে হাতে রাখা ইটালীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলে গণ্য হ'ল। পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপে ইটালীর ব্যবসা অবশ্য খুবই বেড়ে গেল। ক্ষুদ্র আলবেনিয়া তারই তাঁবেদার হয়ে উঠ্ল। কিন্তু এতে তার সাম্রাজ্য ক্ষুধা মিটল না। উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকার আবিসিনিয়ার উপর তার অনেক দিনের লোভ। ১৮৯৬ সালে একবার একে আক্রমণ করে হাব্সিদের হাতে ভীষণভাবে পরাজিতও হয় ইটালী। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির চক্রান্তে সে পরেও সেখানে কিছুই করে উঠ্তে পারে নি। গত ১৯২৮ সালে ইটালী ও আবিসিনিয়া একটি বন্ধুত্বমূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। তখন কে ভেবেছিল কয়েক বছরের মধ্যেই ইটালী অমন করে আবিসিনিয়ার উপরে চড়াও হবে?

নেপ্‌লসে ইটালীর নৌশক্তির মহড়া

জার্ম্মাণ রণতরী 'ডয়েশ্‌ল্যাণ্ড'
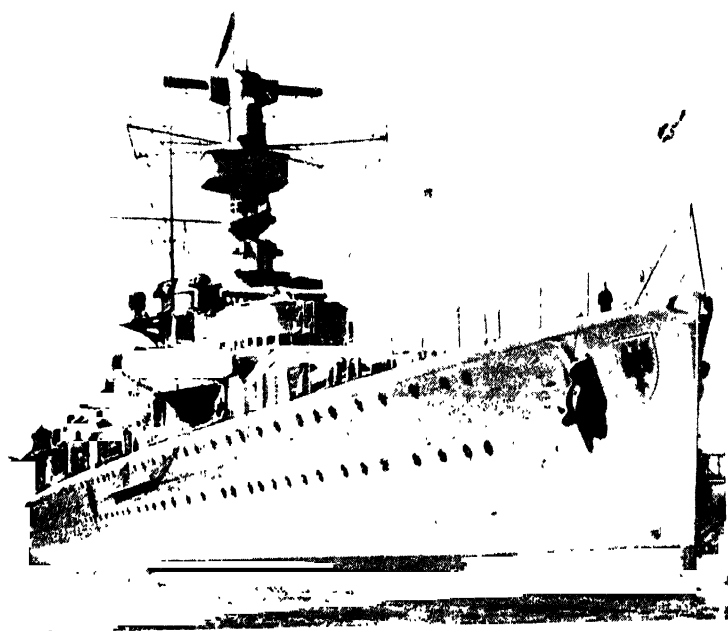
তুর্কীর বেলায় তোমাদের বলেছি যে, তারা এখনও ইটালীকে ভয় করেই চলে। গত যুদ্ধের আগে থেকেই তুরস্কের এশিয়া মাইনরের উপর ইটালীর লোভ ছিল। সেভার্স সন্ধিতে যখন তুরস্ককে উচ্ছেদ করা ঠিক হ'ল, তখন পূর্ব্ব বাঞ্ছিত এশিয়া মাইনর লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে বলে বোধ হ'ল। কিন্তু কামাল আতাতুর্কের আবির্ভাবে সে সাধ আর মিটল না। এশিয়া মাইনরে সে কোন পাত্তাই পেলে না। ইটালী কিন্তু সম্প্রতি এমন কিছু করেছে যাতে তুরস্কের নূতন করে শঙ্কিত হবার কারণ উপস্থিত হয়েছে। তার ঘরের দুয়ারে ঈজিয়ান সাগর। ডোডেকানিজ দ্বীপগুলির সঙ্গে এখানকার দ্বীপ-গুলিকেও ইটালী সুরক্ষিত করে রেখেছে। এ সব ভিত্তি করে আজ তুরস্ককে আক্রমণ করা খুবই সুবিধা।

মুসোলিনী ইটালীর পররাষ্ট্র-নীতিকে মোড় ফিরিয়ে দিলেন শীঘ্রই। ইউরোপ বা এশিয়ার কোন দেশের উপর তিনি লোভ করলেন না। তাঁর নজর পড়ল নূতন বন্ধু আবিসিনিয়ার উপর। তুচ্ছ ছুতা ধরে তার বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ঠুর অভিযান চালালেন। ইটালী কয়েক বছর ধরেই তার অস্ত্রশস্ত্র বাড়িয়ে নিচ্ছিল। লোকে তখন জিজ্ঞাসা করত যে, সে এত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কি করবে? এতদিনে বুঝা গেল ইটালীর অতৃপ্ত সাম্রাজ্য-পিপাসাই অস্ত্রশস্ত্র বাড়াবার একমাত্র কারণ। ফ্রান্স এ সময় (১৯৩৫, ২রা জানুয়ারী) ইটালীর সঙ্গে একটি সন্ধি করে এবং

এতদ্দ্বারা ইটালীকে আফ্রিকায় কিছু সুখ-সুবিধা দিতে স্বীকৃত হয়। কেউ কেউ বলেন, মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযানেও ফ্রান্সের সহানুভূতি ও সম্মতি ছিল। আবিসিনিয়া আক্রমণের পরে কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়েই ইটালীর বিরুদ্ধে বেঁকে বসে ও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের মারফত তার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে আর্থিক শাস্তি বিধানের চেষ্টা করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা যতখানি অবলম্বন করলে ইটালী আবিসিনিয়া অভিযান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হত তারা কিন্তু তা করেনি। ইটালী আকাশ থেকে বিষাক্ত গ্যাস ফেলে ও বোমা ছুড়ে স্বাধীন আবিসিনিয়াকে নিজ অধিকারভুক্ত করে নিল। এ কাহিনী বড়ই নির্ম্মম। আমাদের ভারতবাসীও সেখানে ছিল অনেক। তারাও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই অকারণ যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য। বিখ্যাত 'মহম্মদ আলী ফারম'কে সেখান থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য গুটিয়ে নিতে হয়েছে।

আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে বটে, কিন্তু হাব্সিরা খণ্ড ভাবে হলেও এখনও ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ইটালীর দু' লক্ষ সৈন্য সেখানে মজুত রাখতে হয়েছে তাদের দমন করবার জন্য। এ দেশটির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বহু দিনের। হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনেক স্থলে এর উল্লেখ আছে। হাব্সিরা তাদের দেশকে বলে 'ইথিওপিয়া'।

ইংরেজ ও ফরাসীদের উপরও ইটালীর বিদ্বেষ এদিকে খুব বেড়ে গেল। মুসোলিনীর উপর এতকাল ইংরেজ ও ফরাসীরা

এক রকম খুশীই ছিল। কারণ মুসোলিনী ইটালী থেকে সাম্য-বাদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সাহায্যে শক্তিমান্ হয়ে যখন তিনি সাম্রাজ্য বাড়াতে চাইলেন তখন তারা বাধা না দিয়ে পারে নি। এতে যে তাদের স্বার্থ-হানির খুবই সম্ভাবনা! তাই মুসোলিনী আবিসিনিয়া বিজয়ের পর থেকে অন্য দিকে চোখ ফেরালেন,—অন্য বন্ধু খুঁজতে লাগলেন।

তিনি বন্ধু পেলেনও। মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত জার্ম্মাণীতে আবির্ভাব হ'ল হিটলারের। মুসোলিনীর আবিসিনিয়া-বিজয়ের আগেই হিটলার জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ কর্ত্তা হয়ে বসেছিলেন। ইংরেজ-ফরাসী যখন ইটালীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছিল তখন তিনি তাদের সঙ্গে যোগ দেননি। মুসোলিনী আবিসিনিয়া বিজয়ের পরই কাল বিলম্ব না করে তাঁর সঙ্গে মিতালী করে নিলেন।

জার্ম্মাণীতে হিটলারের অভ্যুদয় মুসোলিনী প্রথমে ভাল চক্ষে দেখেন নি। অষ্ট্রিয়াকে মুসোলিনী বরাবর নিজের তাঁবে রাখতে চেয়েছিলেন। এর উপর ছিল হিটলারের খুবই লোভ। মুসোলিনী যখন দেখলেন রাজ্য বিস্তার ব্যাপারে ইংরেজ ফরাসী তাঁর বিরোধী হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও হবার আশঙ্কা আছে তখন তিনি 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ অষ্ট্রিয়ার উপর সমস্ত দাবি

দাওয়া ত্যাগ করে হিটলারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে সন্ধি হ'ল অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর ভেতর। বিশেষজ্ঞরা একে কিন্তু জার্ম্মাণ-ইটালীয় সন্ধি বলেই উল্লেখ করেছেন। কেননা মুসোলিনীই ছিলেন এই সন্ধির মূলে। এর পর মুসোলিনীর পররাষ্ট্র-নীতি বদলে তো গেলই, একটা সুস্পষ্ট আকারও নিলে এই সময় থেকে।

মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। এই বন্ধুত্বের নামকরণ হয়েছে—'রোম-বার্লিন এক্সিস' বা 'রোম-বার্লিন দণ্ড'। কোন নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে যে এই বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে তা নয়, উদ্দেশ্যে সমতাই উভয়কে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। হিটলারও রাজ্য চান, মুসোলিনীও রাজ্য চান—কাজেই উদ্দেশ্য-সাম্য নয় তো কি? মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ থেকে মুসোলিনী হাত গুটিয়েছেন। হিটলার তাঁর সম্মতি নিয়ে গত বছর অষ্ট্রিয়া দখল করে নিয়েছেন. তাঁর সাহায্যেই চেকোশ্লোভাকিয়ার কতক অংশ পেয়ে গিয়েছিলেন। মুসোলিনীর নজর দক্ষিণ দিকে। আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে ভূমধ্য-সাগরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা দরকার। কিন্তু স্পেনের উপরে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হলে এ সম্ভব হবে কিরূপে? তাই হিটলারের সঙ্গে একযোগে স্পেন-গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিদ্রোহী নেতা ফ্রাঙ্কোকে ধন-জন-অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। ফ্রাঙ্কোর জয়

যখন নিশ্চিত হয়ে এল তখন মুসোলিনী নিজ শক্তির পরিমাপ করে নিয়ে ফ্রান্সের নিকট থেকে কতকগুলি রাজ্য ও সুযোগ-সুবিধা দাবি করে বসলেন। নাইস্, কর্সিকা, টিউনিস, সুয়েজ, জিব্রাল্টার এই কয়টি অঞ্চলের উপরই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এতে শুধু ফ্রান্স নয়, ব্রিটেনও বিচলিত হয়ে পড়েছে।

ইটালীর প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের, বিশেষ করে ব্রিটেনের মনোভাব কি তা তোমাদের এখন বল্‌ব। আবিসিনিয়া অভিযানের সময় থেকে ফ্রান্স ও ইটালীর ভেতর মনোমালিন্য রয়েই গিয়েছে, তা দূর করবার বিশেষ কোন চেষ্টা এ যাবৎ হয় নি। এর উপর ইটালীর উক্ত দাবিতে ওদের ভেতরকার মনোমালিন্য আরো বেড়ে চলেছে। কিন্তু ব্রিটেনের মনোভাবের খুবই পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আবিসিনিয়া বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেনের চেষ্টায় রাষ্ট্র-সংঘ ইটালীর প্রতি শাস্তি দান ব্যবস্থা রদ করলেন। মুসোলিনীও ভূমধ্য-সাগরে ইংরেজের ন্যায্য দাবি স্বীকার করে নিলেন। মুসোলিনী ও হিটলারের স্পেন বিদ্রোহীদের সাহায্য করার মূল উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, মুখে কিন্তু তাঁরা এমন একটি কথা বল্‌লেন যাতে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তা সমর্থন না করে পারল না। বস্তুতঃ বিদ্রোহ আরম্ভ হবার কয়েক মাস আগে স্পেনে সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শে সাম্যবাদমূলক শাসন প্রবর্ত্তিত করবার চেষ্টা হয়। সাধারণ নির্ব্বাচনে সমাজতান্ত্রিক ও

দ্বিতীয় আতঙ্কের কারণ হলেন মুসোলিনী, এখন তৃতীয়টি সম্বন্ধে তোমাদের বল্‌তে হবে।

বর্ত্তমানে ইটালীর শক্তি কিরূপ দাঁড়িয়েছে? ইটালী ফ্রাঙ্কোর জন্য কি-ই না করেছে, কাজেই সেখানে তার কর্ত্তৃত্ব খুবই খাটবে। সেখানে যদি তার খানিকটা কর্ত্তৃত্বও স্থাপিত হয় তাহলে সমগ্র ভূমধ্যসাগরের উপরই তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে! তার সমর শক্তির আভাষ তো তোমাদের আগেই দিয়েছি। বিমানপোত ও সাবমেরিনের সাহায্যেই সে ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব করতে থাক্‌বে। ফ্রান্সের যে অঞ্চলগুলির উপর সে তার দাবি জানিয়েছে তা হয়ত সে পাবে না। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে শক্তি বেড়ে যাওয়ায় ইংরেজ ও ফরাসীর তরফে ইটালীর সঙ্গে কোন না কোন ভাবে আপোষ করতেই হবে। ইংরেজ ইঙ্গ-ইটালীয় সন্ধি দ্বারা ইটালীর শক্তি অনেকটা স্বীকার করে নিয়েছে। সাম্রাজ্যের অংশ কোনো সাম্রাজ্যওয়ালা রাষ্ট্রই কিন্তু ছেড়ে দিতে চাইছে না, সহজে যে কেউ কাউকে দেবে এমন কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। একারণ অনেকে ভূমধ্যসাগরেই একটা ভাবী মহাসমরের আশঙ্কা করছেন। ভূমধ্যসাগরতীরে লিবিয়া, লোহিত সাগর তীরে এরিট্রিয়া, ভারতমহাসাগর তীরে সোমালিল্যাণ্ড, নূতন অধিকৃত আবিসিনিয়া বর্ত্তমানে ইটালীর সাম্রাজ্যভুক্ত। ধন সম্পদের দিক দিয়ে ইটালীর পক্ষে এগুলি তেমন লাভজনক হয়

আধুনিক যুদ্ধ-বিমানপোত

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র—কামানসজ্জিত ট্যাঙ্ক

নি; কারণ এদের অধিকাংশই মরুভূমি ও পাহাড় পর্ব্বতে ভরা। কিন্তু রাজনীতির দিক হতে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুদান মাঝখানে না থাকলে ভূমধ্যসাগর থেকে ভারতমহাসাগর পর্য্যন্ত এক লপ্তে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড ইটালীর অধিকারে আস্‌ত। তবে ইটালী এখনই কিন্তু একেবারে ভারত মহাসাগর তীরে এসে পৌঁছেছে। এখানে সে একটি নৌঘাঁটি স্থাপন করতে চাইছে। এর বিপরীত দিকেই ভারতবর্ষ! কাজেই ইটালীর শক্তি বৃদ্ধিতে ভারতবাসীরও যথেষ্ট ভাবনার কারণ ঘটেছে।

—তিন—

জার্ম্মাণী

ইটালীর প্রসঙ্গে তোমরা জেনেছ, ইটালীর কর্ণধার মুসোলিনী আর জর্ম্মাণীর 'ফুর্‌হের' হিটলার ইদানীং সমস্ত কাজ একযোগে করে চলেছেন। এতে লোকের আতঙ্ক আরও বেশী বেড়ে গেছে। আমাদের দেশে কথায় বলে, 'একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর'! এখানেও মুসোলিনীর দোসর জুটেছে হিটলার। মুসোলিনী ইদানীং বড় শক্তিগুলির উপর কেন খাপ্পা হয়েছেন তা তোমরা এইমাত্র জেনে নিয়েছ। এখন হিটলারের কথাই তোমাদের বল্‌ব।

মহাযুদ্ধের পরে লুঠের মাল বণ্টনের সময় ইটালীর উপর খুবই অবিচার করা হয়েছিল, কিন্তু জার্ম্মাণীর উপর যে অবিচার করা হয়েছিল তার তুলনাই হয় না। জার্ম্মাণী তখন অপরাধীর কাঠগড়ায়। যুদ্ধের যত দোষ তার একার উপরই চাপান হ'ল। ইংরেজ, ফরাসী প্রমুখ মিত্রশক্তিরা যে কখনো কোন অন্যায় করেছে বা করতে পারে একথা তখন তোলাই হ'ল না। কাজেই ভের্সাই সন্ধিতে জার্ম্মাণীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার সমস্ত রকম ব্যবস্থাই হ'ল। এর কিছু কিছু আভাষ আগে তোমাদের দিয়েছি। প্রেসিডেন্ট উইলসন বলেছিলেন, ইউরোপে এক একটি জাতি নিয়ে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই ভাবে রাজ্য গঠিত হলে এখানকার দ্বন্দ্বের নিরসন হবে। কিন্তু কার্য্যকালে তা হয় নি। একথা তোমাদের পরে বিশেষ করে বল্‌ব। জার্ম্মাণী থেকে এমন বহু অংশ ছেটে অন্য রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল যে সব স্থলে জার্ম্মাণদেরই বাস বা সংখ্যায় জার্ম্মাণদেরই আধিক্য। আল-সেস্-লোরেন দেওয়া হ'ল ফ্রান্সকে, বেলজিয়ম পেলে ইউপেন ও মালমেডি। লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে পরে যুক্ত করে দেওয়া হয় মেমেল। ডেনমার্কও খানিকটা পেলে। পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর একটি বিশেষ অংশ নিয়ে পোল্যাণ্ডের সৃষ্টি করা হ'ল। পূর্ব্ব প্রুশিয়া মূল জার্ম্মাণী থেকে আলাদা হয়ে রইল। আপার সাইলেসিয়ার বেশীর ভাগই পেল পোল্যাণ্ড। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগে পড়ল

এর সামান্য একটু জায়গা। অনেকে মনে করেন, চেকোশ্লোভা-কিয়ার সুদেতেন জার্ম্মাণ অঞ্চল জার্ম্মাণী থেকে ছেটে চেকোশ্লোভাকিয়াকে দেওয়া হয়। এ কিন্তু ভুল। বোহিমিয়া বরাবর এ থেকে আলাদা ছিল। যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এ অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অধীন ছিল। পশ্চিম জার্ম্মাণীর সার নামে একটী জায়গা রাষ্ট্র-সংঘ নিযুক্ত কমিশনের অধীন করা হয়। তখন কথা হয় যে, পনর বছর পরে গণ-ভোট দ্বারা স্থির করা হবে, সারবাসীরা জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুক্ত হবে কি না। জার্ম্মাণী তার সমস্ত উপনিবেশও হারাল। এর কিছু পরে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবং তার স্কন্ধে চাপান হ'ল বহু সহস্র কোটি টাকার ঋণ-ভার!

নিরুপায় হলেও জার্ম্মাণী তখন এতে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবই তাকে মেনে নিতে হয়। মিত্রশক্তিদের ইচ্ছা অনুযায়ী জার্ম্মাণী অতঃপর একটি রিপাবলিক বা গণতন্ত্রে পরিণত হ'ল। সম্রাট উইল্‌হেল্‌ম কাইজার আগেই দেশ ছেড়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাইজার এখনও জীবিত। তাঁর বয়স আশী পেরিয়ে গেছে। ইনি কে জান? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ইনি তাঁরই দৌহিত্র,—পরলোকগত রাজা পঞ্চম জর্জ্জের পিস্‌তুত ভাই। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে ওয়াইমার নামক শহরে বসে এই রিপাবলিকের নিয়মতন্ত্র রচিত হয়। এজন্য একে বলা হ'ল

ওয়াইমার রিপাব্লিক। প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রীসভা ও রাইখ্ষ্টাগ বা পালামেণ্ট—এই নিয়ে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হ'ল। প্রেসিডেণ্ট গণ-ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হবার কথা হয়। সমগ্র সাবালক নরনারী রাইখ্ষ্টাগের সদস্য নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা পেল। হিটলারের আবির্ভাব পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীতে দুইজন প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন—প্রথম ফ্রেডারিক এবার্ট, দ্বিতীয় ফন্ হিণ্ডেনবুর্গ। হিণ্ডেনবুর্গের জীবিতকালেই হিটলার চ্যান্সেলর বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর হিটলার প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলর দুই-ই হলেন। তিনি এখন নাম নিয়েছেন 'ফুর্হের' বা জাতির নেতা।

ভের্সাই সন্ধির পর থেকে হিটলারের 'ফুর্হের' হওয়া পর্য্যন্ত এই পনর বছর জার্ম্মাণীর আত্ম-সংগঠনের যুগ। মিত্রশক্তিরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণীর শক্তির পরশ তারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে। সে পুনরায় যাতে মাথা তুলতে না পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছিল ভের্সাই সন্ধিতে। সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি তার থেকে কেড়ে নেওয়া হ'ল, উপরন্তু ক্ষতি-পূরণের এমন বোঝা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল যা শোধ করা ছিল তার পক্ষে সাধ্যাতীত। জার্ম্মাণী নির্দ্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ করছে না এই অজুহাতে ফরাসীরা ভাব রূঢ় প্রদেশ দখল করে নিল! ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীর উপর ব্রিটেন ও আমেরিকার মনোভাব অনেকটা বদলে গেছে। ফ্রান্সের

একাজ তারা সমর্থন করল না। কিছুকাল পরে ফ্রান্স তার সৈন্য রূঢ় থেকে তুলে নেয়। এর পরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ম ও জার্ম্মাণীর ভেতর লোকর্ণো চুক্তি বিধিবদ্ধ হয়। এর প্রধান সর্ত্ত ছিল—কেউ কাউকে আর অতঃপর আক্রমণ করবে না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, গত মহাসমর এই সময়েই সত্যি সত্যি শেষ হয়েছে। জার্ম্মাণী সমর-ঋণ শোধ করতে অপারগ দেখে মিত্রশক্তিদের যেন তার উপর কতকটা দয়া হ'ল! 'ডস্' নামক একজন মার্কিণ অর্থনীতিবিদের নেতৃত্বে ঋণ শোধের পরিকল্পনা স্থির হয়, এর নাম হ'ল 'ডস্ প্ল্যান'। এতে স্থির হয় যে, মিত্রশক্তিরা জার্ম্মাণীব শিল্প কারখানায় টাকা ঢালবে, আর এর লাভের অঙ্ক থেকে সে কিস্তি মত সুদ ও ক্ষতিপূরণ দু-ই দেবে! অতঃপর জার্ম্মাণীর শিল্প-বাণিজ্য বেশ বেড়ে গেল। জার্ম্মাণ জনসাধারণ কিন্তু এর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হ'ল না, বরং তাদের ভেতরে বেকার সংখ্যা বেড়েই চল্‌ল। কেমন করে বেড়ে গেল জান? কারখানায় উন্নত ধরণের যন্ত্র ব্যবহৃত হলে জনমজুর কমই দরকার হয়। কাজেই তারা বেকার হয়ে পড়ে। আজকের যন্ত্র যুগে একে একটা অভিশাপ বল্‌তে হবে। সাধারণের করভারও বেড়ে গেল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতেই যদি সব নিঃশেষ হয়ে যায় তা'হলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে কিরূপে? কয়েক বছর নানাভাবে চেষ্টা করার পরে ১৯৩১ সালে ক্ষতিপূরণ দেওয়া থেকে জার্ম্মাণী রেহাই

পায়। কিন্তু তখন সমস্ত জগতেই ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে, জার্ম্মাণীর অবস্থা ফেরবার আশাই রইল না।

ভের্সাই সন্ধি—জার্ম্মাণ জাতির গলায় কাঁটার মত বিঁধছিল। এ থেকে যে-সব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল তার উপরও ছিল তার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। লোকার্নো চুক্তির পর জার্ম্মাণী রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য হ'ল বটে, কিন্তু রিপাব্লিকের উপর জার্ম্মানদের বিতৃষ্ণা বেড়েই চল্‌ল। তারা মনে প্রাণে এর উচ্ছেদই কামনা করত। হিটলার এই সময়ে নাৎসী দলের মারফৎ জাতির মনোভাব ব্যক্ত করলেন—সব অন্যায়ের মূল ভের্সাই সন্ধি ;—একে নাকচ করতে হবে,—সঙ্গে সঙ্গে যারা এতে সাহায্য করেছিল সেই সব ইহুদীদের করতে হবে নিপাত, আর পরাজয়ের গ্লানি থেকে যে শাসন ব্যবস্থা তৈরী হয়েছে তা করতে হবে ধ্বংস। এই তিনটি মূল মন্ত্র নিয়ে হিটলার আসরে অবতীর্ণ হলেন। একে একে সব বাধা বিপত্তি তিনি উৎরে উঠলেন। জার্ম্মাণীর প্রতি মিত্রশক্তিদের, বিশেষ করে ফ্রান্সের ব্যবহার আর বিশ্বব্যাপী বাজার মন্দা তাঁকে সঙ্কল্পের পথে অনেকটা এগিয়েই দিয়েছিল। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ জার্ম্মাণীর শাসন ভার তাঁর হাতে দিয়ে দিলেন।

হিটলারের আদর্শ হলেন মুসোলিনী। মুসোলিনী ইটালীর জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন হিটলারও জার্ম্মাণীতে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী

'মেঁ ক্যাম্পে' এ কথা স্পষ্টই বলেছেন। ফাসিজ্‌মের আদর্শে দেশের সর্ব্বত্র নাৎসি দলের শাখা গঠন করলেন। 'ষ্টর্ম ট্রুপার' বা ঝটিকাবাহিনী গঠিত হ'ল। জার্ম্মাণীতে একটি দলের বেশী থাক্‌তে দেওয়া হবে না। অন্য কোন দল সভা করতে থাকলে এই ঝটিকাবাহিনী তা ভেঙে দিত। শাসন-ভার গ্রহণ করে হিটলারের প্রথম কাজ হ'ল অন্য সব দলের বিলোপ সাধন। জার্ম্মাণীতে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী দলের প্রাধান্য ছিল খুবই; তিনি ছলে বলে এ সকলেরই কণ্ঠরোধ করলেন। ওয়াইমার শাসনতন্ত্র অনুসারে জার্ম্মাণীতে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। নির্ব্বাচিত সদস্যদের ভেতর সংখ্যা গরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন করত, সরকার বিরোধী দলগুলিও সেখানে থাক্‌ত। সমস্ত আইনকানুনও অধিকাংশের ভোটেই পাস করিয়ে নেওয়া হত। হিটলার পার্লামেণ্টের দ্বারা একটি আইন পাস করিয়ে এর সমস্ত ক্ষমতা লোপ করে দিলেন! রাইখ্‌ষ্টাগ এখন একটা বিতর্ক সভায় পর্য্যবসিত হয়েছে! সমস্ত আইন-কানুন মন্ত্রীরাই জারি করতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার হলেন জার্ম্মাণীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। শাসন-বিভাগ, দেশ-রক্ষা বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ সব বিভাগেই মন্ত্রীরা রয়েছেন, তবে তাঁর কথামতই এদের চল্‌তে হয়। তিনি জার্ম্মাণ রাষ্ট্র-বাহিনীগুলির একমাত্র অধ্যক্ষ!

হিটলার বললেন, জার্ম্মাণজাতি প্রাচীন আর্য্যদের বংশধর!

জাতির বিশুদ্ধতার অপহ্নব ঘটেছে ইহুদীদের সংস্রবে এসে। কাজেই ইহুদী-দলন জার্ম্মাণীতে প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। গত বছর নবেম্বর-ডিসেম্বরে এ অত্যাচার এতই চরমে উঠে যে, বিশ্ববাসী তো বিস্ময় মানলই, অনেক হিটলার-পন্থী জার্ম্মাণও নাকি এতে সন্ত্রস্ত না হয়ে পারে নি। জাতির পুনর্গঠনের পক্ষে যে-সব প্রাথমিক বাধা সৃষ্ট হয়েছিল ভের্সাই সন্ধিতে, হিটলার তা একে একে দূর করে দিচ্ছেন। ভের্সাই সন্ধিতে ঠিক হয়েছিল জার্ম্মাণী এক লক্ষের উপর সৈন্য রাখ্‌তে পারবে না। নৌবাহিনী তাকে সামান্যই রাখ্‌তে দেওয়া হয়েছিল। বিমানবাহিনী কিন্তু নষ্ট করে দেওয়া হয়। তবে এ সময় এ রকম একটি প্রস্তাবও বিধিবদ্ধ হয় যে, অন্য রাষ্ট্রগুলিকেও আস্তে-আস্তে দেশরক্ষা-বাহিনীগুলি হ্রাস করতে হবে। এ সব রাষ্ট্র এ কথা মোটেই মানেনি। বরং ফ্রান্স প্রভৃতি অনেকে এগুলি খুবই বাড়িয়ে চলেছিল। হিটলার প্রস্তাব করলেন, হয় সকলকেই সৈন্যসামন্ত কমাতে হবে, না হয় তার রণশক্তি বাড়াবার ক্ষমতাও তাদের স্বীকার করে নিতে হবে। রাষ্ট্র-সংঘে এ দাবি পেশ করা হ'ল, কিন্তু বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি হিটলারের কথায় কর্ণপাত করল না। হিটলার অবিলম্বে রাষ্ট্র-সংঘ ত্যাগ করে দেশবাসীকে বাধ্যতামূলক যুদ্ধ শিক্ষা দিতে সুরু করলেন! এযাবৎ ব্যোমবাহিনী গঠন নিষিদ্ধ হলেও জার্ম্মাণীতে বিমানপোতের মোটেই অভাব ছিল না। এগুলিকে যুদ্ধোপযোগী

রোমে মুসোলিনী হিটলারকে অভ্যর্থনা করিতেছেন

ইতালীর সৈন্যবল ও রণসম্ভার

করে তৈরী করা হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাই একটি ব্যোমবাহিনীও জার্ম্মাণীতে দেখা দিল। এখন বিমানপোতে জার্ম্মাণী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। মাসে সে নাকি হাজার-খানা বিমানপোত তৈরী করতে পারে! গত ১৯৩৫ সালে ইংরেজের সঙ্গে নৌ-চুক্তি করে নৌবহর পুনর্গঠনেরও ব্যবস্থা করে নিয়েছে সে। এই চুক্তিতে অনুপাত ঠিক হয়েছিল ১০০%৩৫, অর্থাৎ ইংরেজের যদি থাকে একশ' খানা জাহাজ, জার্ম্মাণের থাকবে পঁয়ত্রিশখানা। সাব্‌মেরিণ সম্বন্ধে কিন্তু সর্ত্ত করা হয় যে, প্রয়োজন হ'লে ইংলণ্ডের সমান করে সে সাবমেরিণ তৈরী করতে পারবে। ইদানীং ইংরেজকে নোটিশ দিয়েছে যে, সে তাদের সমান করেই সাব্‌মেরিণ তৈরী করবে।

হিটলার তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি পশ্চিম ইউরোপে কোন রাজ্য চান না, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে যদি তাঁর কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হয় তা হলেই তিনি সন্তুষ্ট থাক্‌বেন। মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে জার্ম্মাণীকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ইটালী ফ্রান্সের প্রভাবে ঈর্ষ্যান্বিত হলেও সে-ও চায়নি যে, ওখানে জার্ম্মাণীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। অষ্ট্রিয়া নিয়ে জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইটালীর বিরোধ ছিল খুবই। ইটালী প্রসঙ্গে এ কথা তোমাদের বলেছি। জার্ম্মাণীর উপর ব্রিটেনের মনোভাব কিন্তু খুবই বদলে গেল। হিটলারের উদ্দেশ্য তাঁর

বইয়ে যেরূপ প্রকাশ পেয়েছে তাতে ব্রিটেনের মনোভাব বদ্‌লে যাবারই কথা। জার্ম্মাণী বড় হলে তার তো আর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে না! তিনি তো আর তাদের সাম্রাজ্য চাইছেন না। হিটলার রাষ্ট্র-সংঘ ত্যাগ করে ও যদৃচ্ছ সৈন্য সংখ্যা ও রণসম্ভার বৃদ্ধি করে একে একে যখন ভের্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলি ভেঙে দিচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে ইংরেজ তাঁর সঙ্গে নৌ-চুক্তি করে বস্‌ল! হিটলারের বইয়ে আর একটি কথা আছে—সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে এক করতে হবে। 'বেশ কথা, এক করলে তাতে আমার ক্ষতি কি?'—ইংরেজ এই ভাব্‌লে। সার প্রদেশে গণভোট নেওয়া হ'ল, প্রায় সকলেই জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুক্ত হতে চাইল। জার্ম্মানীকে সার প্রদেশ দেওয়া হ'ল। অন্যান্য দেশের জার্ম্মাণদের ভেতরও এক হবার বাসনা জাগে এ সময় থেকে। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে ছোট রাষ্ট্রগুলিতেও ব্যবসার ছলে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে সুরু করল সে।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটে যাতে ইউরোপের রাজনীতির গতি একেবারে ফিরে যায়। ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে। রাষ্ট্র-সংঘ তাকে বাধা দেবার জন্য যে-সব চেষ্টা করেছিল, আগে তা তোমাদের বলেছি। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ইংরেজ ও ফরাসীই এতে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ল ও ইটালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। জার্ম্মাণী রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য নয়। সে ভাবল ইটালীকে হাত করবার এই সুবিধা। সুতরাং

যখন দেখ্‌লে যে, ইটালী রাষ্ট্র-সংঘ তথা বড় শক্তিগুলিকেও অগ্রাহ্য করে আবিসিনিয়া জয়ে উদ্যত, সেই সুযোগে হিটলার রাইনল্যাণ্ড পুনরায় অধিকার করলেন। রাইনল্যাণ্ড জার্ম্মাণীরই একটি অংশ। কিন্তু ফ্রান্সের সুবিধার জন্য এবং ভের্সাই সন্ধি ও পরে লোকার্নো চুক্তি অনুসারে একে নিরস্ত্রীকৃত করে রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ, জার্ম্মাণী, ফরাসী সীমা হ'তে এ অঞ্চলের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন রকম দুর্গ বা ঘাঁটি নির্ম্মাণ করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত না। রাইনল্যাণ্ড অধিকার কালে কেউ বিশেষ উচ্চবাচ্য করে নি, কিন্তু সকলেই বুঝতে পেরেছিল জার্ম্মাণীর শক্তি কিরূপ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ঐ বছরই মে মাসে ইটালী আবিসিনিয়া জয় করে। পরবর্ত্তী জুলাইয়ে হিটলার মুসোলিনীর আবিসিনিয়া জয় স্বীকার করলেন আর বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন তাঁর সঙ্গে। অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে একটা আপোষ-রফাও করে নিলেন। এর পরে সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই স্পেনে বিদ্রোহ সুরু হ'ল। আর অমনি হিটলার—মুসোলিনী বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন! অনেকে বলেন, এ দুজনের উস্কানিতেই জেনারল ফ্রাঙ্কো অত শীঘ্র স্পেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহস পেয়েছিল। ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করার মূলে উভয়েরই নাকি কতকটা গূঢ় ও ব্যাপক উদ্দেশ্য আছে। হিটলার মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে এবং মুসোলিনী দক্ষিণ ইউরোপে নিজ নিজ

আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এজন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতেও অঙ্গীকার করেছে প্রথম থেকে। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মাণী ও তার কিছু পরেই ইটালীও যখন জাপানের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'ল তখন এ আর কারো অজানা রইল না। হিটলার ও মুসোলিনী নানাভাবে আটঘাট বেঁধে নূতন রাজ্যই যে দাবি করবেন এতে আর সন্দেহ রইল না। জার্ম্মাণরা আর মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখতে পারলে না। তারা সমস্বরে হৃত উপনিবেশগুলি চেয়ে বসল। তোমরা জেনেছ ইংরেজের অধীনেই এর বেশীরভাগ রয়েছে। কিন্তু তারাও তা হাত ছাড়া করতে রাজি নয়। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই ইংরেজের টনক নড়তে আরম্ভ হয়েছে!

গত দু' বছরে আরও এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটেছে যে জন্য ইউরোপবাসী সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ইউরোপ ছাপিয়ে তার ঢেউ অন্যত্রও গিয়ে পৌঁছেছে। জার্ম্মাণীর অস্ত্রশস্ত্র দিন দিন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে। সেখানে 'মাখনের চেয়ে বন্দুক উৎকৃষ্টতর' এই নীতি অহরহ প্রচারিত হচ্ছে। একটি চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতির সর্ব্বশক্তি রণসম্ভার নির্ম্মাণে নিয়োজিত হয়েছে। হিটলার গায়ের জোরেই যেন বাজি মাৎ করতে চাইছেন। মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর আঁতাত পাকা। উভয়ে উভয়ের দেশ পরিদর্শন করেছেন, সামরিক আয়োজনও উভয়ের পরামর্শ মতই করা হচ্ছে। যে অষ্ট্রিয়া নিয়ে এতকাল

ইটালী ও জার্ম্মাণীর ভেতর বিরোধ চলেছিল সেই অষ্ট্রিয়াকে একে অন্যের সম্মতি নিয়েই দখল করেছে। হিটলার এখন অষ্ট্রিয়ারও মালিক। হিটলারের নীতি হ'ল সব জার্ম্মাণকে এক রাষ্ট্রভুক্ত করা। এতকাল তিনি তার উদ্দেশ্য সাধনে কারো সাহায্য বা সমর্থন পাননি। এবার মুসোলিনী তাঁর পক্ষে আসায় তাঁর আর কোন চিন্তাই রইল না। প্রতিবেশী দেশগুলি কিন্তু প্রমাদ গণেছে, বিশেষ করে তাঁরা যখন দেখ্‌লে অষ্ট্রিয়া গ্রাস করবার সময় ফ্রান্স ব্রিটেন কেউই টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করলে না। জার্ম্মাণীর চারদিকে সব দেশেই জার্ম্মাণ রয়েছে। এ ভাবে সকলকে এক করতে গেলে তাদের অনেকেরই অস্তিত্ব যে লোপ পেয়ে যাবে! তাদের আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয় অষ্ট্রিয়া-গ্রাসের দু' এক মাসের ভেতরই তা বেশ বুঝা গেল। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেনে জার্ম্মাণরা এতদিন শুধু স্বায়ত্ত-শাসন চেয়েছিল। হিটলারের অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর তাদের দাবিও বেড়ে গেল। হিটলার কিছুকাল টালমাটাল করবার পর এ অঞ্চলকে জার্ম্মাণীভুক্ত করা সাব্যস্ত করলেন, আর এজন্যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে চরম পত্রও দিলেন,—গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৩৮)। সমস্ত ইউরোপ যেন কেঁপে উঠ্‌ল। যুদ্ধ বাধে আর কি!—চেকোশ্লোভাকিয়ার উৎপত্তি হয় ভের্সাইয়ে ভের্সাই সন্ধির ফলে। ইংরেজ, ফরাসী এজন্য একে রক্ষা করতে বাধ্য ছিল। তার উপরে ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া এর সঙ্গে পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক

চুক্তিতেও তখন আবদ্ধ ছিল। তাই লোকে ভাবল বুঝি-বা যুদ্ধ বাধে। কিন্তু যুদ্ধ বাধ্‌ল না। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে ছুবার দেখা করে তাঁর ক্ষুধা মেটা-বার আয়োজন করলেন! ব্রিটিস, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও ইটালীর রাষ্ট্রনায়কেরা মিউনিক সহরে মিলিত হয়ে হিটলারের দাবি পূরণ করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার যে-যে অঞ্চলে জার্ম্মাণদের বাস সে সকলই হিটলারকে দিয়ে দেওয়া হ'ল! সকলেই বিস্মিত হলেন, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী বিস্মিত হলেন চেকো শ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি ডক্টর এডোয়ার্ড বেনেশ্। দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে এ দেশটি যে তাঁদের গড়ে তোলা, আর আজ কিনা কয়েকটি লোকের চক্রান্তে তাকে অপরের হাতে সঁপে দেওয়া হ'ল ? বেনেশ্ এ গ্লানি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে গেলেন। চেকোশ্লোভাকিয়া অংশবিশেষ হারাল বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হিটলারেরই অধীন হয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল!

মিউনিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে আজ ছ' মাসও হয় নি, কিন্তু এর ভেতরে ইউরোপে গুরুত। সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর এতে ইন্ধন জোগাচ্ছে জার্ম্মাণী ইটালী এক যোগে। জার্ম্মাণীতে ইহুদী দলন ও উপনিবেশের দাবি সমানভাবে চলেছে। স্পেনে ফ্রাঙ্কো বিজয়লাভ করেছে। ব্রিটেন এবং ফ্রান্সও তাকে মেনে নিয়েছে। ইটালী এখানকার

ঘাঁটি আগ্‌লে থাক্‌লে জার্ম্মাণী নির্ব্বিঘ্নে মধ্য ইউরোপে তার কামনা চরিতার্থ করতে পারবে। মধ্য ইউরোপে যদি তার আধিপত্য বিস্তৃত হয় তাহলে তাকে কে আর ঠেকাবে? আজ সে তার বহু দিনের অভিলাষ পূর্ণ করতে চলেছে। মিউনিক চুক্তির পর এদিক্‌কার পথও পরিষ্কার হয়ে গেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্লোভাক ও রুথেনিয়া প্রদেশ এর ভেতরেই স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করে দেয়। হিটলারের আদেশে চেক-সরকার তাদের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়েছেন। শ্লোভাক ও রুথেনিয়া বাদ দিলে চেকোশ্লোভাকিয়ার বোহামিয়া ও মোরাভিয়া নামে যে অংশটুকু বাকি থাকে তাকেও জার্ম্মাণীর কবলে আনা হয়েছে সম্প্রতি! এখন চেক-অঞ্চল, শ্লোভাক অঞ্চল, বৃহত্তর জার্ম্মাণীর এক একটি অংশ! 'স্বাধীন' রুথেনিয়াকে হাঙ্গেরী নিয়ে নিয়েছে। হিটলার কিন্তু পরখ করে দেখছেন রুথেনিয়া হাঙ্গেরির অধীন হলে তাঁর কতটা লাভ-ক্ষতি হবে। লিথুয়ানিয়ার 'মেমেল' অঞ্চলও জার্ম্মাণী অধিকার করে নিয়েছে সম্প্রতি। এটি আগে জার্ম্মাণীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিটলারের বর্ত্তমান কার্য্যে আজ তাই সমগ্র জগৎ সন্ত্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে পড়েছে।

—চার—

বৃহত্তর জার্ম্মাণী

প্রেসিডেণ্ট উইলসন যে চৌদ্দ দফা সর্ত্ত দিয়েছিলেন তার একটি ছিল—এক একটি জাতিকে এক একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু অন্যান্য মিত্রশক্তিদের চক্রান্তে তাঁর এ সর্ত্ত অনুযায়ী কাজ হয় নি। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ মিত্রশক্তিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জার্ম্মাণী ও হাঙ্গেরীর শক্তিকে এমনভাবে খর্ব্ব করে দেওয়া হবে যাতে তারা ভবিষ্যতে আর মাথা তুলতে না পারে। জার্ম্মাণী থেকে এমন অনেক অংশ বিচ্ছিন্ন করা হ'ল যে-সব স্থলে ছিল জার্ম্মাণদেরই বাস। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভেঙে যে-সব রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তাতেও বিস্তর জার্ম্মাণ বাস করে। এই সকল জার্ম্মাণ অধ্যুষিত অঞ্চল এক করে দিলে, খর্ব্ব বা দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাকুক, জার্ম্মাণীর শক্তি আগের চেয়ে শতগুণে বেড়ে যেত। মিত্রশক্তিদের এ মোটেই কাম্য হতে পারে না। তাই নূতন রাষ্ট্র গঠনকালে তারা নজর রেখেছিল জার্ম্মাণী ও হাঙ্গেরীর শক্তি খর্ব্ব করারই দিকে।

পোল্যাণ্ডের কথা তোমাদের আগে বলেছি। পোল্যাণ্ড এক সময়ে স্বাধীন রাজ্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রুশিয়া (বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর নেতৃস্থানীয়), অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও রুশিয়া

জাম্মানীর রণসজ্জা।

মুসোলিনীকে জার্ম্মানীর সৈন্যবল প্রদর্শন
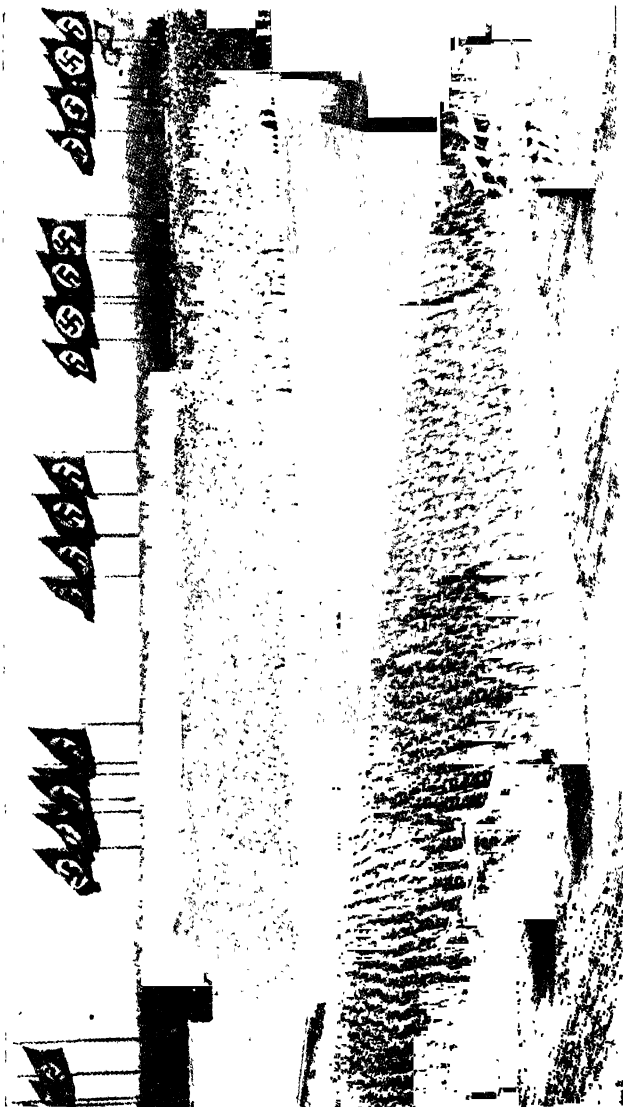
যড় করে নিজেদের মধ্যে একে ভাগ করে নেয়। যুদ্ধের সময় তার আবার স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ঘটে। মাসারিক যেমন মিত্রশক্তিদের সাহায্য করে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা লাভ সম্ভব করে দেন, পোল্যাণ্ডেও পিলসুড্‌স্‌কি জার্ম্মাণ পক্ষে যোগ দিয়ে এর স্বাধীনতা সম্ভব করে তুলেন। যুদ্ধ শেষে ভের্সাই সন্ধিতে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষিত হ'ল। কিন্তু শুধু পোল জাতিকে নিয়ে পোল্যাণ্ড গঠিত হ'ল না। পোল ছাড়া জার্ম্মাণ, ইউক্রেন, রুশ প্রভৃতি জাতির বহু লোকও এখানে রয়ে গেল! পূর্ব্বের চেয়ে এবারকার পোল্যাণ্ডের আয়তনও বেড়ে গেল। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ভেঙে গড়া হ'ল অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া। অষ্ট্রিয়ার টাইরল জুড়ে দেওয়া হ'ল ইটালীর সঙ্গে। উইলসনের সর্ত্তটি কিরূপ পুরাপুরি ভঙ্গ করা হ'ল তাও একবার দেখ। অষ্ট্রিয়ায় এক কোটি জার্ম্মাণের বাস। তাদের নিয়ে করা হ'ল আলাদা একটা রাষ্ট্র। টাইরলে আড়াই লক্ষ জার্ম্মাণ ছিল। এ অংশ ইটালী পেল। হাঙ্গেরীর উপরে মিত্রশক্তিদের ক্রোধ খুব। এখানকার শাসকজাতির নাম মেগিয়ার। এই মেগিয়াররা যাতে জোট বাঁধতে না পারে তার ব্যবস্থা হ'ল। মেগিয়ারদের অধিকাংশই হাঙ্গেরীতে রয়ে গেল, কিন্তু অনেককেই চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার মধ্যে পুরে দেওয়া হ'ল। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভেতরে হ'ল বহু জাতের সমাবেশ। চেক,

শ্লোভাক, জার্ম্মাণ, মেগিয়ার, ইউক্রেন ও পোল—এই সব মিলে তৈরী হ'ল চেকোশ্লোভাকিয়া ! মিত্রশক্তিরা ভেবেছিল মধ্য ইউরোপে এদের দিয়ে একটি প্রবল রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে পারলে জার্ম্মাণী বা হাঙ্গেরী আর মাথা তুলতে পারবে না। কিন্তু তাদের সে ধারণা আজ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ বছর পরে চেকোশ্লোভাকিয়াকে আজ জার্ম্মাণী, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে নিয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হ'ল সার্ভ, ক্রোট ও শ্লোভেনদের নিয়ে। এখানেও এই তিন জাতির ভেতরে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। রুমানিয়ার অস্তিত্ব আগেও ছিল, কিন্তু যুদ্ধের পরে তার আয়তন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়। পূর্ব্ব ইউরোপে রয়েছে বুলগেরিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক। তুরস্কের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। গ্রীস ও বুলগেরিয়া মিত্রশক্তিদের চক্রে পড়েনি বলে তাদের সীমানার বিশেষ কোন রদবদলও হয়নি।

কি উদ্দেশ্যে, মধ্য ইউরোপকে এরূপ অস্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাগ করা হয়েছিল তা এইমাত্র তোমাদের বল্‌লাম। যুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে সরে দাঁড়াল। মধ্য ইউরোপে বিশেষ কোন স্বার্থ না থাকায় সেখান থেকে ব্রিটেনও আস্তে আস্তে হাত গুটাল। এখন রইল ফ্রান্স ও ইটালী। যুদ্ধের ক্ষত সারতেই ইটালী ব্যস্ত, সে এদিকে প্রথমে তেমন দৃষ্টি দিতে পারল না। বাকী রইল

ফ্রান্স। জার্ম্মাণ-যুদ্ধ ফ্রান্সের ভূমিতেই হয়েছিল। কাজেই তার ক্ষতির পরিমাণ অন্য কারুর সঙ্গে তুলনাই হয় না। জার্ম্মাণীর শক্তি সে যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল এমন কেউ করেনি। জার্ম্মাণরা আবার যাতে প্রবল না হতে পারে সেই চেষ্টাই হ'ল ফ্রান্সের সব চেয়ে বেশী। সুতরাং মধ্য ইউরোপের এই নূতন রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগা তার পক্ষে স্বাভাবিকই। কিন্তু তার এই আশা শেষ পর্য্যন্ত যে সুফলপ্রসূ হয় নি তা তোমরা দেখ্‌তেই পাচ্ছ। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে আলাদা করে দেবার পর অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে নানাভাবে মিলিত হতে চেয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সের প্রতিবন্ধকতায় তা সম্ভব হয় নি। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র মিলে 'লিট্‌ল আঁতাত' বা ছোট আঁতাত গঠন করা হ'ল। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, পররাষ্ট্র-নীতি—সব বিষয়ে তারা এক যোগে চল্‌বে স্থির হয়। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক মিলে হ'ল বলকান আঁতাত'। বলকান উপদ্বীপে এগুলি অবস্থিত বলে সকলে এদের নাম দিয়েছে বলকান রাষ্ট্র, আর এদের ভেতরের আঁতাতকে বলা হয় বলকান আঁতাত। এরও মূলে ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সঙ্গেও পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এ সময়ে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে আলাদা চুক্তি হয়েছিল। মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে ইটালীর ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু প্রসার

লাভ করলেও ফ্রান্সের বিশেষ আশঙ্কার কারণ ঘটে নি। কারণ এ সব দেশ আগে থেকেই তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তারই নির্দ্দেশ মত চল্‌তে স্রুরু করেছিল।

জার্ম্মাণীকে কিন্তু দাবিয়ে রাখা চল্‌ল না। হিটলার একে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করে শীঘ্রই শক্তিমান করে তুল্‌লেন। হিটলারের উদ্দেশ্যের কথা আগে তোমাদের বলেছি। যে-সব রাষ্ট্রে জার্ম্মাণ রয়েছে সে-সব রাষ্ট্রের ভয় হবারই কথা। ইটালীও জার্ম্মাণীর প্রতি এজন্য আগে প্রসন্ন ছিল না। অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীভুক্ত না হয় এ-ও ছিল তার ইচ্ছা। কেননা তা হলে তার দেশে যে-সব জার্ম্মাণ আছে তারাও তো জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবে! তাই তখন মনে হয়েছিল ফ্রান্স ও ইটালী বুঝি একযোগে জার্ম্মাণীর বিপক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু যে সব গুরুতর ব্যাপার ঘটায় ফ্রান্স ও ইটালীতে ছাড়াছাড়ি হয় এবং জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইটালী সন্ধিবদ্ধ হয় তা তোমরা আগেই জেনেছ।

মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ থেকে ফ্রান্স তার হাত গুটাতে বাধ্য হয়েছে, ইটালীও তার সব দাবি-দাওয়া একরূপ ত্যাগ করেছে। হিটলার জার্ম্মাণীর শাসন-ভার হাতে নিয়েই পূর্ব্ব ইউরোপে তার আধিপত্য বিস্তারে মন দিলেন। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, তুরস্ক সর্ব্বত্রই ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার নূতন উপায় অবলম্বন করা হ'ল। জার্ম্মাণী এই সব দেশের কাঁচা মালের বেশীর ভাগ কিনে

তার দাম বাকী ফেল্‌লে। অনেকদিন যায়, দাম শোধ হয় না। অথচ এ রাষ্ট্রগুলির টাকার খাক্‌তি খুবই। জার্ম্মাণ-সরকার তখন বললে, 'নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তোমরা আমার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় কর। এ সব তো তোমাদের দরকার হবে।' ছোট রাষ্ট্রগুলি অগত্যা তাই করতে বাধ্য হ'ল। এ দেশগুলিতে অন্যেরা যাতে ব্যবসা করতে না আসে জার্ম্মাণী তারও ব্যবস্থা করল সঙ্গে সঙ্গে। এখান থেকে কাঁচা মাল চড়া দামে কিনে কম দামে ইউরোপের বাজারে সে বিক্রয় করতে লাগ্‌ল। ক্রেতারাও দেখ্‌লে সুবিধা। অতদূরে টাকা খরচ করে গিয়ে চড়া দামে মাল কেনার দরকার কি? জার্ম্মাণী এ ভাবে এই সব দেশ থেকে অন্যদের তাড়াবার উপক্রম করেছে। ইটালী জার্ম্মাণী আঁতাত পাকা হওয়ার পর থেকে জার্ম্মাণীর প্রাধান্য এ অঞ্চলে খুবই বেড়ে গেছে।

জার্ম্মাণীর শক্তি আজ কিরূপ দুর্দ্দম তা তোমরা বেশ জান্‌তে পেরেছ। পূর্ব্ব ইউরোপে যেখানে যত জার্ম্মাণ আছে সকলেই আজ জার্ম্মাণীর সঙ্গে এক হতে চাইছে। অষ্ট্রিয়া জার্ম্মাণীর অধিকারে এসেছে। প্রথমে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মাণ অঞ্চল জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এদিকে হাঙ্গেরী ও পোল্যাণ্ডও জার্ম্মাণীর দেখাদেখি নিজ নিজ দিককার অংশ কেড়ে নিয়েছে! জার্ম্মাণী এখন চেকো-শ্লোভাকিয়া সম্পূর্ণই গ্রাস করে ফেলেছে। চেক ও শ্লোভাক

উভয়ের উপরই তার নিজ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। চেক রাষ্ট্র ছিল ইউরোপের একটি উন্নত শ্রীসম্পন্ন দেশ। এর মজুত স্বর্ণ, পনর শ' খানা যুদ্ধ বিমানপোত, দু' লক্ষের উপর সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও এ সব নির্ম্মাণের কারখানা সকলই জার্ম্মাণীর হাতে এসেছে! এত-দিন হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে এক রাষ্ট্র-ভুক্ত করা। তা করতে হ'লে জার্ম্মাণ অঞ্চলগুলি অবশ্য তার চাই। ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইটালী সকলেই মিউনিক চুক্তির দ্বারা তার এ দাবি স্বীকার করে চেকোশ্লোভাকিয়ার খানিকটা তাকে ফিরিয়েও দিয়েছিল। এখন থেকে কিন্তু অন্যদের জায়গায় হস্তক্ষেপ করে তাঁর পূর্ব্ব ইউরোপে রাজ্য বিস্তার কার্য্যও সুরু হ'ল। এ সব অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি তাই হিটলারকে তোয়াজ করতে লেগে গেছে। উদ্দেশ্য, যাতে তাদের অস্তিত্ব কোনক্রমে বজায় থাকে। এ সব দেশ এক একটি, বাংলাদেশের দু' তিনটি বা তিন চারটি জেলা মিলিয়ে যতখানি হয় ততখানি। কোন কোনটি আবার এর চেয়েও ছোট। তথাপি তারা এতদিন স্বাধীন রাষ্ট্রের মতই সব কাজ করে চলেছিল। জার্ম্মাণীর যেরূপ লোভ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে এদের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে-সুইডেন পর্য্যন্ত আজ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

—এক—

ফ্রান্স

ভের্সাই সন্ধি, ইটালী, জার্ম্মাণী প্রভৃতি প্রসঙ্গে ফ্রান্সের কথাও তোমরা কিছু কিছু জেনে নিয়েছ। এখন এ দেশটি সম্বন্ধে আলাদা করে তোমাদের কিছু বল্‌ব। তোমরা ইতিহাসে ফরাসীদের সম্বন্ধে অনেক কথা পাবে। ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফরাসী উভয়ে একই সময়ে রাজ্য-বিস্তার করতে চেয়েছিল। এজন্য এখানে এদের ভেতরে অনেকদিন ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহও চলেছিল। ইউরোপেও এদের লড়াই চল্‌ত খুবই। ফরাসী বিপ্লবের শেষে ইংরেজরা বীর নেপোলিয়নকে যুদ্ধে হারিয়ে এবং সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে আটক রাখে। সেখানে নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়। এসব কারণে ইংরেজের উপর ফরাসীরা বরাবর বিদ্বিষ্ট হয়েই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে আজ পর্য্যন্ত নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ফরাসীরা ইংরেজের সঙ্গে এসে মিলেছে। ইউরোপে তাদের শত্রু সংখ্যা

বা শত্রু শক্তি যতই বেড়ে যাচ্ছে ফরাসীরা ততই ইংরেজের বন্ধুত্ব লাভের চেষ্টা করছে। আর ইংলণ্ডও তাই চায়। এযুগে নিজের প্রভাব বজায় রাখতে হলে ফ্রান্সের শক্তি ও স্বাধীনতা অটুট রাখতেই হবে। ইংরেজ ও ফরাসী অভিন্ন আত্মা বলেই এখন মনে হচ্ছে সকলের।

বর্ত্তমানে শিক্ষা সভ্যতায় যেমন ইউরোপ সকল মহাদেশের শীর্ষে, তেমনি আবার ইউরোপে ফ্রান্সও সকল দেশের সেরা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী ফ্রান্সেই প্রথম উচ্চারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবই ইউরোপকে মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। এর পর থেকে এখানকার প্রত্যেক জাতি নব জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়,—আগেকার সামন্ত রাজ্যগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়,—ইউরোপে নূতন নূতন স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি হতে থাকে। নেপোলিয়নের পতনের পর ফ্রান্সে কখনো রাজতন্ত্র কখনো প্রজাতন্ত্র শাসন চল্‌তে থাকে। শেষে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃক বিজিত হবার পর বিগত ১৮৭১ সালে এ একটি পুরোপুরি রিপাব্লিক বা প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রজাতন্ত্র শাসন কাকে বলে জান? সেখানে রাজা থাক্‌বে না, সাধারণ লোকে ভোট দিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি নির্ব্বাচিত করবেন। ইনিই কিন্তু সর্ব্বেসর্ব্বা নন্, যদিও আজকালকার রাজাদের চেয়ে এঁর ক্ষমতা
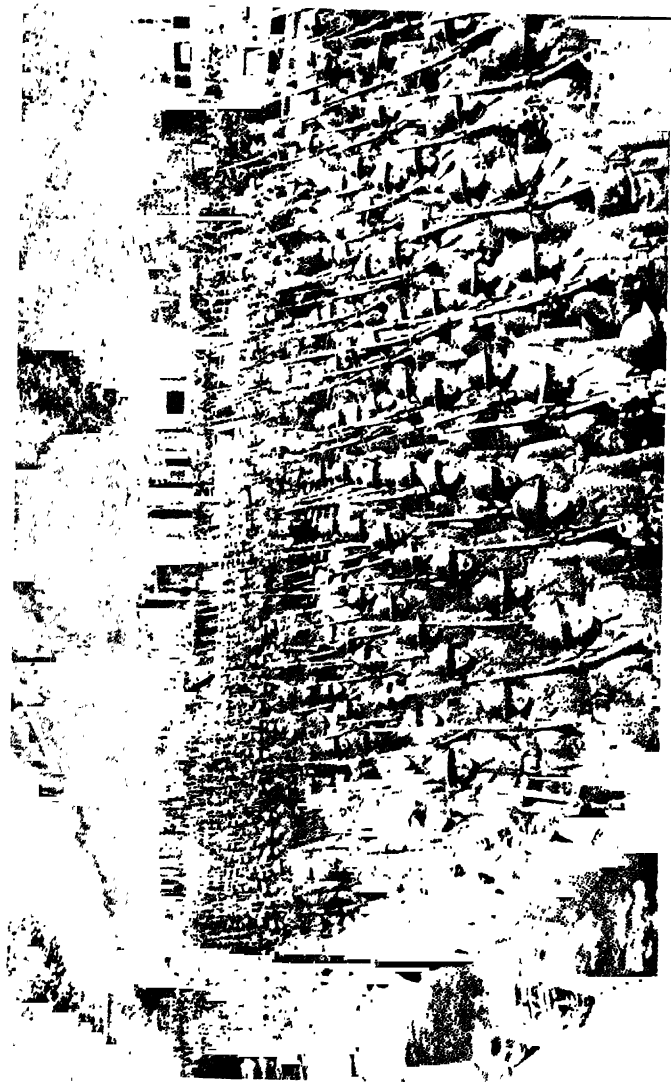
ফরাসী পদাতিক সৈন্যের পরিক্রমণ

জার্ম্মান কবলিত প্রাহা শহরের একটি দৃশ্য

ঢের বেশী। এ সব শাসনে সাধারণতঃ দুটি করে পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধি-সভা থাকে। তাদের ভেতর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। প্রেসিডেণ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন; প্রধান মন্ত্রী আবার তাঁর সহকর্ম্মীদের বাছাই করে নেন্। আজকালকার ডিমোক্রাসী বা গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রগুলিতেও এই ব্যবস্থা। তবে প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রে এইটুকু প্রভেদ করা যায় যে, প্রথমটিতে রাষ্ট্রের মাথায় থাকেন নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট, দ্বিতীয়টিতে থাকেন বংশানুক্রমিক রাজা। ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথম শ্রেণীর, আর ব্রিটেন দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র। রাজার ক্ষমতা এখন খুবই সীমাবদ্ধ। কাজেই উভয় রকম শাসনকেই আমরা গণতন্ত্র বলে আখ্যা দিতে পারি। উভয়েতেই, অধিকাংশের মত অনুসারে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে অদল-বদল হলেও ১৮৭১ সালের শাসনতন্ত্রই এখনও ফ্রান্সে বাহাল আছে। ফ্রান্সের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট এলবার্ট-লেব্রাঁ। সাত বছর পর পর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়। ফ্রান্সে দুটি পার্লামেণ্ট। প্রথমটিকে বলে 'চেম্বার অফ্ ডেপুটিজ্' বা প্রতিনিধি-পরিষদ, আর দ্বিতীয়টিকে বলে 'সেনেট'। সাবালক নরনারীর ভোটে প্রতিনিধি-পরিষদের সভ্যরা নির্ব্বাচিত হন। ইংলণ্ডের হাউস্ অফ্ কমন্স-এর ন্যায় এ পরিষদের ক্ষমতা খুবই বেশী। চার বছর অন্তর অন্তর

সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই চার বছরের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন আর হতে পারে না। কাজেই মন্ত্রীসভার পতন হলেও সেখানে প্রতিনিধি-পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয় না। বিলাতে কিন্তু মন্ত্রীসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফ্রান্সে কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ বার পর্য্যন্তও মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছে—দেখা গেছে, তথাপি সাধারণ নির্ব্বাচন হয়নি। মন্ত্রীসভার এত বেশী বার পতন হবার বিশেষ কারণ আছে। ফ্রান্সে বহু দল। চার পাঁচটি দল একত্র না হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে মন্ত্রীসভা গঠন করা সেখানে সম্ভব হয় না। আবার বেশীদিন বিভিন্ন দলের মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা বড়ই কঠিন কাজ। এজন্যই বার বার ঐরূপ মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। প্রতিনিধি-পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৬১৮। পঁচিশ বা তদূর্দ্ধ বছরের সকলেই এর সভ্য নির্ব্বাচিত হতে পারে। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যাপারে ফ্রান্সে কিন্তু এমন একটি ব্যবস্থা আছে যা বিলাতে বা অন্যত্র কোথাও নেই। সেটা হচ্ছে এই—ফরাসী উপনিবেশগুলির কেউ কেউ এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে।

ফরাসীদের সাম্রাজ্য বেশ বড়। তবে ভারতবর্ষে তার জায়গা খুব কম। এখানকার পণ্ডিচেরী, কারিকল ও মাহি মাত্র ফ্রান্সের অধীন। এখান থেকে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন ঐ প্রতিনিধি সভায়। সেনেটেও ভারতবর্ষ থেকে একজন

প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে। ভারতবাসীরা কিন্তু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে সেখানে যান না। ভারতবাসীরা এদেশে বসে ভোট দিয়ে সেখানকার কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করে থাকেন। ফ্রান্সের পুরণো কয়েকটি উপনিবেশরই মাত্র এ অধিকার আছে। আবার কোন কোনটি, যেমন কোচীন-চীন, মাত্র প্রতিনিধি-পরিষদেই প্রতিনিধি পাঠাতে পারে ;—সেনেটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয় নি। ফ্রান্সের সেনেট অনেকটা বিলাতের হাউস অফ্ লর্ডসের মত। এর সদস্য সংখ্যা ৩১৪। এর ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সেনেটে চল্লিশ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সী লোকেরা সভ্য নির্ব্বাচন করবার বা নির্ব্বাচিত হবার অধিকারী। এর ক্ষমতা বিলাতের হাউস অফ্ লর্ডসের চেয়ে কিছু বেশী। কেননা প্রতিনিধি পরিষদে কোন আইন পাস হলে সেনেট তা ইচ্ছা কর্‌লে নাকচ করে দিতে পারে।

ফ্রান্সের লোকসংখ্যা আমাদের বাংলাদেশেরই মত, কিন্তু এর আয়তন শ্যামের মত বা বাংলা-বিহার-আসাম একত্র করলে যতখানি হয় প্রায় ততখানি। এর সাম্রাজ্যও যে খুব বড় তা তোমাদের বলেছি। আয়তনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরই এর স্থান বলা যায়। লোকসংখ্যা কিন্তু এর তুলনায় খুবই কম, —ছয় কোটির কিছু বেশী। আফ্রিকার অধিকাংশ মরুভূমি, এখানে রয়েছে বলে এর লোকসংখ্যা এত কম। অধীন দেশগুলির সঙ্গে ফরাসীদের ব্যবহার অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের

মতই নির্ম্মম। এখানে যে-সব প্রগতি বা স্বাধীনতামূলক আন্দোলন হয় তা তারা কঠোর হস্তে দমন করে থাকে। মাঝে সিরিয়ার উপর ফ্রান্সের ব্যবহার খুবই রূঢ় হয়ে উঠেছিল। এটি কিন্তু যুদ্ধের পরে প্রাপ্ত একটি ম্যাণ্ডেট! নিছক প্রয়োজনের বশেই একে আবার কিছু স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে ইদানীং। শ্যামের পূব দিক্‌কার ফরাসী হিন্দু-চীনের বরাতও হয়ত ফিরে যাবে শীঘ্র। কারণ জাপান এখন একেবারে তার ঘরের দুয়ারে এসে পৌঁছেছে!

এ থেকে এসে পড়ে ফ্রান্সের বর্ত্তমান অবস্থার কথা। বর্ত্তমান অবস্থা মানে—এক কাথায়, তার বর্ত্তমান পররাষ্ট্র-নীতির হালচাল। ১৮৭১ সালে জার্ম্মাণীর কাছে সে হেরে যায়, তোমরা জেনেছ। এ সময় তার আলসেস-লোরেন জার্ম্মাণীর হস্তগত হয়। এর পর থেকেই সে ব্রিটেনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। এদিকে আবার ব্রিটেন ও জার্ম্মাণীর রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু তা হ'লে কি হ'বে? যখন দেখা গেল জার্ম্মাণীর রাজ্য-লিপ্সা বেড়ে গিয়ে ব্রিটেনের স্বার্থেও আঘাত দিতে চাইছে তখন সে-ও হুসিয়ার হয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। জার্ম্মাণীর শক্তি বৃদ্ধিতে ফ্রান্সেরও যথেষ্টই ভয়ের কারণ ছিল। কাজেই গত ১৯০৬ সালে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ভেতর পরস্পর সাহায্যমূলক সন্ধি হয়ে গেল। তখন থেকেই সামরিক ব্যাপারে তারা এক যোগে

কাজ আরম্ভ করেছিল বলেই বিগত মহাসমরে জার্ম্মাণীর সম্মুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল এবং জয়লাভও করেছিল।

গত মহাযুদ্ধের বেশীর ভাগই হয় ফ্রান্সের বুকের উপর। এজন্য তার ক্ষতিও হয়েছিল সকলের চেয়ে বেশী। জার্ম্মাণীর উপর তাই তার জাতক্রোধ হওয়া আশ্চর্য্যের কিছুই নয়। ভের্সাই সন্ধিতেও এর ছাপ স্পষ্টই পড়েছিল। ভের্সাই ও পরবর্ত্তী সন্ধিগুলিতে জার্ম্মাণী ও তার বন্ধুদের যেমন হীনবীর্য্য করে ফেলা হয়েছিল তাতে ফ্রান্সের আশ্বস্ত হবারই কথা। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, এত করেও সে তেমন আশ্বস্ত হতে পারে নি। এসব কথা তোমাদের আগেই বলেছি। যুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ থেকে হাত গুটিয়ে নিল। গত ১৯২২ সালে লয়েড জর্জ্জ মন্ত্রীসভার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশের মনোভাবও জার্ম্মাণীর উপর ধীরে ধীরে বদলাতে লাগলো। জার্ম্মাণীর কাছ থেকে দ্রুত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ফ্রান্স রূঢ় প্রদেশ দখল করেছিল। এ কিন্তু তাকে সম্পূর্ণই নিজ দায়িত্বে করতে হয়েছিল, ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্র কেউ তার সাহায্যে আসে নি। ভের্সাই সন্ধির সময় মঁসিয়ে ক্লেমেন্সো ছিলেন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী, তার পরে মঁসিয়ে পঁয়কারে প্রধান মন্ত্রী হন। উভয়েই ছিলেন কড়া মেজাজের লোক। বিধ্বস্ত জার্ম্মাণীকে নানা রকমে অপদস্থ করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

ফরাসী জনসাধারণ কিন্তু তাঁদের উপর বিরূপ হয়ে উঠ্‌ল এই সব কারণে। এ সময় উদারপন্থী নেতা মঁসিয়ে ব্রিঁয়া ফ্রান্সের কর্ণধার হন। তিনি পরে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিত্রশক্তিদের সত্যকার সন্ধি হ'ল লোকার্ণো চুক্তিতে। এ চুক্তির কথা আগে তোমাদের বলেছি।

পররাষ্ট্র-নীতিতে অতঃপর কতকটা উদারতা প্রকাশিত হলেও অতীতকে ফরাসীরা মোটেই ভুল্‌তে পারল না। তারা যখন দেখ্‌লে যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়িয়েছে, আর ব্রিটেন ক্রমে ক্রমে জার্ম্মাণীর দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখন তাদের মনে খুবই অসোয়াস্তির ভাব দেখা দেয়। দু'ভাবে এর প্রতিকারের চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। ফ্রান্স রণসম্ভার বাড়িয়ে চল্‌ল, পূর্ব্ব সীমা সুরক্ষিত করবার আয়োজনও করতে লাগল্। যে ভাবে ঘাঁটি ও দুর্গ নির্ম্মাণ করে আর খাদ কেটে এ অঞ্চল সুরক্ষিত করা হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'মাজিনো লাইন'। রাষ্ট্র-সংঘ ইতিমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যূন ষাট্‌টি রাষ্ট্র তখন এর সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত। ব্রিঁয়া প্রস্তাব করলেন, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হোক। যুদ্ধ-বিগ্রহ বিবাদ-বিসম্বাদ রোধ করে পরস্পরের ভেতর ঐক্য স্থাপন করতে হলে এরূপ রাষ্ট্র গঠন একান্ত আবশ্যক। এ কথায় কিন্তু তখন কেউ কর্ণপাত করলে না। তিনিও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না,—যখন তাঁর এ চেষ্টা ব্যর্থ

হ’ল তখন তিনি বল্‌লেন, সভ্যগণকে দিয়ে রাষ্ট্র-সংঘের আদেশ মান্য করাতে হলে তার উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী থাকা চাই। এ ব্যতিরেকে আদেশ মান্য করানো সম্ভব নয়। এ প্রস্তাবেও কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু এটা ত প্রকৃত সত্য কথা, যে, পেছনে উপযুক্ত শক্তি না থাকায় রাষ্ট্র-সংঘের আদেশ অগ্রাহ্য করতে কেউ দ্বিধাবোধ করে নি। এখন আবার অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ব্রিঁয়ার প্রথম প্রস্তাবটি উল্লেখ করে বলছেন যে, ইউরোপে একটি যুক্ত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হলে তার সমস্যা ঘুচবে না, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠারও আর আশা থাকবে না। ব্রিঁয়া যখন দেখলেন তাঁর সব প্রস্তাবই একে একে বাতিল হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ কেলগের সঙ্গে কেলগ-ব্রিঁয়া প্যাক্ট নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এর মর্ম্ম হ’ল, জগতের প্রত্যেক রাষ্ট্রকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—ভবিষ্যতে কেউ কারো বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করবে না। এ নির্ব্বিবাদী প্রস্তাবে সকলেই সায় দিল। ইটালী জার্ম্মাণী জাপানও তখন এতে সায় দিতে দ্বিধা বোধ করল না। ব্রিঁয়া ১৯৩১ সালে মারা গেলেন। ব্রিঁয়া যেমন তেমন লোক ছিলেন না। তিনি এগার বার ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ও ষোল বার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী হন। অন্যান্য বিভাগেও তিনি মন্ত্রিত্ব করেছিলেন কয়েক বার।

ফ্রান্সের শাসন-ভার যখন যে দলের হাতেই থাকুক না কেন,

দেশরক্ষা ব্যাপারে কিন্তু সকলেই সমান তৎপর। ব্রিঁয়া একরকম ভাবে চেষ্টা করেছেন, অন্যেরা অন্যভাবে চেষ্টা করছে—এই যা তফাৎ। পূর্ব্বেকার সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে মধ্য ইউরোপে যে-সব নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে ফ্রান্স তাদের হাত করতে চেয়েছে অবিরত। নূতন অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে সে তাদের টাকা জোগান দিয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্রকে এক একটি গোষ্ঠীভুক্ত করে রাখ্‌তেও চেষ্টা করেছে সে। চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া—মিলে হ'ল 'লিটল আঁতাত'। রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস ও তুরস্ক হ'ল বলকান আঁতাত ভুক্ত। ফ্রান্স মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে এই আঁতাত-রাষ্ট্রগুলি মারফত নিজ প্রভাব বিস্তার করতে লেগে গেল। এতে সে অনেকটা সক্ষমও হ'ল। কিন্তু ১৯৩১ সালের আরম্ভেই যে বিশ্বব্যাপী বাজার মন্দা দেখা দেয় তাতে তাকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, এবং সে ক্রমশঃ ও-সব অঞ্চল থেকে হাত গুটাতে বাধ্য হয়।

এর কিছু পরেই জার্ম্মাণীতে হিটলারের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীরাও চিন্তিত হয়ে পড়ল খুবই। কারণ তারা তাঁর আত্মজীবনী পাঠ করে ফ্রান্সের উপর তাঁর আক্রোশের কথা আগেই জেনে নিয়েছিল। ফরাসীরা ইংরেজের উপরও তেমন করে নির্ভর করতে পারল না, কারণ এরা যেন তখন জার্ম্মাণ ভক্ত হয়ে পড়েছে বেশী মাত্রায়। অথচ হিটলারকে বাগ

মানানো চাইই। হিটলার যদিও মুসোলিনীর নীতি অনুসরণ করে জার্ম্মাণীতে প্রভুত্ব লাভ করেছেন তথাপি মুসোলিনী তাঁকে প্রথমে ভাল চক্ষে দেখ্‌তে পারেন নি। জার্ম্মাণীর শক্তি বাড়লে তারও যে ভয়! বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়া—যার উপরে হিটলারের খুবই লোভ, একবার জার্ম্মাণীভুক্ত হলে তিনি ইটালীর সীমানায় এসে পড়বেন। তাই এই অবসরে ফ্রান্স ও ইটালীর ভেতর বন্ধুত্ব বেড়ে গেল। গত ১৯৩৫ সালে ফ্রাঙ্কো-ইটালিয়ান চুক্তি দ্বারা এই বন্ধুত্ব পাকা করবার চেষ্টা হয়। তখনকার ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ লাভাল আফ্রিকায় ইটালীকে অত্যধিক ক্ষমতা দিয়ে মুসোলিনীকে হিটলার বিরোধী করে তুলবার চেষ্টায় ছিলেন। ফ্রান্স এর আগে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়েছিল। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে এযাবৎ তার কোনরূপ আঁতাত হয়নি। এবার কিন্তু উভয়ের ভেতর একটা পরস্পর সাহায্যমূলক চুক্তিও সাধিত হ'ল। ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে একটি চুক্তি করে নিল। এ সময় চার দিককার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার এরূপ সন্ধিবদ্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। হিটলার তখন রাষ্ট্র-সংঘ পরিত্যাগ করে ও ভের্সাই সন্ধির অনেকগুলি সর্ত্ত একে একে ভঙ্গ করে জার্ম্মাণীর শক্তি বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। ফ্রান্স অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল তখনই যখন সে দেখ্‌লে যে, হিটলারের নানারকম হঠকারিতার

মধ্যেই ব্রিটেন তাঁর সঙ্গে একটা নৌ-চুক্তি করতে বসে গেছে! জার্ম্মাণী কি অজুহাতে অস্ত্র-শস্ত্র বাড়িয়ে চলেছিল তা আগে তোমাদের বলেছি। ফ্রান্স জার্ম্মাণীকে যে বিশ্বাস করে না—তা তো তোমরা জানো। কাজেই জার্ম্মাণীর ইচ্ছামত নিজ অস্ত্রশস্ত্র কমাতে সে রাজী হ'ল না। এর পরে রাজনীতির পট অতি দ্রুত বদ্‌লে যায়। ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তি বিধিবদ্ধ হবার কিছুকাল পরেই কেমন করে ফ্রান্স ও ইটালীর ভেতর ছাড়াছাড়ি সুরু হয়, আর কিরূপেই বা বর্ত্তমানে উভয় শত্রু পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ায় সে কথা ইটালী প্রসঙ্গে বলেছি। প্রতিবেশী জার্ম্মাণী ও ইটালী এখন ফ্রান্সের ঘোর বিরোধী হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সের দক্ষিণে স্পেন। ইটালী ও জার্ম্মাণী স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কোকে নানাভাবে সাহায্য করে তাকে বিজয়ী করে তুলেছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জয়ের মুখে ফ্রাঙ্কোকে স্বীকার করে বড় রকম কূটনীতিক চাল চেলেছে বলে মনে হয়। তথাপি ফ্রান্সের সোয়াস্তি নেই। ফ্রাঙ্কো যে তাদের কথাই মেনে চল্‌বে তার বিশ্বাস কি? ব্রিটেনের উপর তার কতখানি নির্ভর চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে তা বেশ বুঝা গেছে। এক সময়ে নানাদেশের সঙ্গে সন্ধি ও চুক্তি করে জার্ম্মাণীর সঙ্গে আড়ি দিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল সে। এখন তারই নানা দিক থেকে আক্রান্ত হবার উপক্রম! এরূপ অবস্থা দেখে ইটালী আগেকার চুক্তি বাতিল করে দিয়ে তার কর্সিকা, টিউনিস, সুয়েজ ও জিবুতি

দাবি করে বসেছে ! এসব ছেড়ে দিতে কিন্তু ফ্রান্স একেবারেই গররাজী। ফ্রান্সের দুর্ব্বলতা ব্রিটেনকেও দুর্ব্বল করে তুলবে সন্দেহ নেই ! এজন্য গত মহাসমরের পূর্ব্বে যেমন উভয়ে একযোগে সামরিক শক্তি বাড়িয়েছিল, এখনও সেইরূপ বাড়িয়ে চলেছে। ব্রিটেনের সঙ্গে ইটালীর চুক্তি হয়েছে, কিন্তু তাতে, কি ব্রিটেন— কি ফ্রান্স কারুরই আশঙ্কা কমে নি। উভয়েই সমর-সম্ভার বৃদ্ধি করছে আশাতীত রূপে। ফ্রান্সের নৌবহর, বিমানবহর ও সৈন্যবাহিনী আজ সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। জগতের যে-কোন প্রধান শক্তির সঙ্গে এর তুলনা চলে। তার সাম্রাজ্যও সুরক্ষিত করবার চেষ্টা চল্‌ছে খুবই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশ-রক্ষা, সাম্রাজ্য-রক্ষা উভয় ব্যাপারেই ব্রিটেনের উপরে তার নির্ভর করতে হবে। ব্রিটেনও সুযোগ বুঝে তাকে নিজ মত অনুযায়ী চলতে বাধ্য করছে।

এর ভেতরে আর একটি ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি। জার্ম্মাণী চেক-রাষ্ট্র একেবারে আত্মসাৎ করে ফেলেছে ! এ নিয়ে ইউরোপে আজ জটলার অন্ত নেই। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মসিয়েঁ দালাদিয়ের একটি আইন পাশ করিয়ে নিয়েছেন যাতে করে ফ্রান্সের সামরিক, আর্থিক ও রাজস্ব বিষয়গুলি নিজ ইচ্ছা মত পরিচালিত করতে পারেন। ফ্রান্সের আত্মরক্ষার জন্য এ একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

—দুই—

ব্রিটেন

ব্রিটেনও আত্মরক্ষার প্রয়োজন বেশী করে অনুভব করছে ইদানীং। কয়েক বছর পূর্ব্বে দেশের রণ-সম্ভার বৃদ্ধির জন্য সে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করে। এখনও এর মেয়াদ ফুরোয় নি। এ কাজে সে ব্যয় করছে কত জান? তিন শ' কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ চার হাজার, সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা! প্রতি বছরে এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ খরচ হচ্ছে। এ পরিকল্পনা শেষ হতে না হতেই বর্ত্তমান বছরে (১৯৩৯-৪০) এর উপর আশী কোটি পাউণ্ড বা হাজার বার শ' কোটি টাকা খরচের বরাদ্দ হয়েছে! ব্রিটেনে কিছু কাল ধরে যেন যুদ্ধের আবহাওয়া বইছে। সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ চল্‌ছে অবিরত, যদিও এখনও সেখানে বাধ্যতামূলক প্রথা সুরু হয়নি। নৌবহরেতো সে জগতের রাজা। "Rule Britannia, Rule the Waves!" তো তারই কথা। এরোপ্লেন তার কিছু কম ছিল। তাও সে বাড়িয়ে নিচ্ছে অতি দ্রুত। শত্রু-দেশ আক্রমণ করবার নবতন উপায় হচ্ছে বিমানপোত। বিমান পথে আক্রমণ চালাবার ও এ পথে আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যও আয়োজন চলেছে খুব। প্রত্যেক গৃহে

মাটীর নীচে গর্ত্ত খুঁড়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে,—বিমান আক্রমণের সময় তাতে ঢুকে আত্মরক্ষা করবার জন্য। সাধারণগম্য পার্কে, মাঠে ও খোলা জায়গায়ও এরূপ গর্ত্ত খুঁড়ে রাখা হচ্ছে। এ থেকে তোমরা বুঝতে পার ব্রিটেন-বাসীরা কিরূপ যুদ্ধের আশঙ্কা করছে।

সম্প্রতি এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটেছে যাতে ব্রিটেনের পক্ষে এরূপ আয়োজন না করে উপায় নেই। ইউরোপে জার্ম্মাণী নিজ শক্তি অসম্ভব রকম বাড়িয়ে নিয়েছে। সে কার উপর কখন চড়াও হবে ঠিক নেই। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি তার ব্যবহার তোমরা জেনে নিয়েছ। এর প্রথম বার অঙ্গচ্ছেদ করা হয় জার্ম্মাণীর মিউনিক সহরে বসে, আর এ ব্যাপারে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন। ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া চেকো-শ্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্য দায়ী ছিল। ব্রিটেনের এরূপ কোন দায়িত্ব মেনে নিতে তিনি রাজী হলেন না, যদিও রাষ্ট্র-সংঘের বিধি অনুসারে প্রত্যেক সভ্যই প্রত্যেক সভ্যকে রক্ষা করতে বাধ্য! মধ্য ইউরোপে জার্ম্মাণীর স্বার্থ কিন্তু ব্রিটেন আগেই স্বীকার করে নিয়েছিল। হিটলার সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে যে এক করতে চান তাতে সে বাদ সাধবে না এরূপ বলা হয়েছে। তাই সুদেতেন জার্ম্মাণ অঞ্চল জার্ম্মাণীকে ছেড়ে দিতে চেম্বারলেন রাজী হয়েছিলেন। তখন অন্যত্র, এমনকি বিলাতেও কিন্তু রব

উঠেছিল যে, ব্রিটেন চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদে রাজী হয়ে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে ! ফ্রান্সের ততটা নিন্দা হয় নি। কারণ তোমরা তো আগেই দেখেছ, ব্রিটেন ছাড়া তার এখন আর এক পাও নড়বার জো নেই। ব্রিটেন, ফ্রান্সের ন্যায় চেকোশ্লোভাকিয়াও একটি গণতন্ত্র। তার প্রতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এরূপ ব্যবহার দেখে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই অনেকে সন্দিহান হন।

জার্ম্মাণী কিন্তু এতেই নিরস্ত হয়নি। মিউনিক চুক্তির সমস্ত সর্ত্তই ভঙ্গ করে সে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছে ! এবার ব্রিটেনের সুস্থ হয়ে বসে থাক্‌বার উপায় রইল না। যে নীতির বশবর্ত্তী হয়ে সে পূর্ব্বে জার্ম্মাণীকে সমর্থন করেছিল এর ভেতর তার নামগন্ধও খুঁজে পেল না। চেকরা, শ্লোভাকরা এক একটী ভিন্ন জাত। তাদের রাজ্য গ্রাস করার কোন অধিকার তার নেই। জার্ম্মাণীর পররাজ্য হরণ কার্য্যে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র মাত্রেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, গ্রীস সকলেই এখন পরামর্শ কর্‌ছে, ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী অন্য কোন দেশ আক্রমণ করলে তাকে কিরূপে বাধা দেওয়া যাবে। বিশ্বরাজনীতির ব্যাপারে ব্রিটেন যে নেতৃত্ব হারিয়েছে বলে বোধ হয়েছিল তা আবার ফিরে পাবার সম্ভাবনা ঘটেছে।

ব্রিটেন

ব্রিটেন কি কারণে জগতে নেতৃত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল? তার বিশাল সাম্রাজ্যের কথা তোমরা বইয়ে পড়েছ—ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না! এ শুধু বিশাল নয়, বহু বিস্তৃতও বটে। এ বিষয়ে সে সকল দেশের সেরা। বিশ্ব দরবারে কিন্তু এর জন্য তার সম্মান এতটুকুও বাড়েনি। তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে। অন্যান্য জায়গার প্রবাসী শ্বেতাঙ্গরাও আন্দোলন চালিয়ে তার কাছ থেকে স্বায়ত্ত শাসন আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলির উপর তার কঠোর শাসন চলেছে এখনও। ভারতবাসী আমরা, তা খুবই বুঝতে পারছি। অধীনস্থকে দমন করে রাখতে সব সাম্রাজ্যওয়ালা দেশই সমান। তবে কিসের জন্য ব্রিটেনের এত মর্য্যাদা? তার শাসন-নীতিই তাকে এ মর্য্যাদা দান করেছে। তার শাসন ব্যবস্থা যুগে যুগে বিদেশীর বিস্ময় জাগিয়েছে। এমন একদিন ছিল, যখন সকলেই তাঁর আদর্শে নিজ নিজ দেশের শাসন-তন্ত্র গড়ে নিয়েছিল। এক কথায় এর নাম দেওয়া হয়েছে 'ডিমোক্রাসি' বা গণতন্ত্র। আজকাল অন্য রকম শাসন ব্যবস্থাও দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্র-মূলক শাসনের কর্ম্মপটুতা ও কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে প্রশ্নও উঠেছে আজ, তথাপি এ নীতিই এখন পর্য্যন্ত সকলের প্রীতি আকর্ষণ করছে।

ব্রিটেনের গঠন-তন্ত্রের সঙ্গে তার ইতিহাস ঘনিষ্ঠ

ভাবে জড়িয়ে আছে। তোমরা ব্রিটেনের ইতিহাস যত পড়্‌বে, গঠন-তন্ত্রের তাৎপর্য্যও তত বুঝতে পারবে। রাজার কাছ থেকে প্রজাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার এ কাহিনী বড়ই বিচিত্র। ক্রমওয়েল সাধারণের পক্ষ নিয়ে রাজার শিরশ্ছেদ পর্য্যন্ত করেছিলেন! সে আজ তিন শ' বছর আগেকার কথা। এরূপ শত শত বিপর্য্যয়ের ভেতর থেকে ব্রিটেনের শাসন ব্যবস্থা আজ বর্ত্তমান আকার লাভ করেছে। ইংলণ্ডের রাজা এখন নামকোয়াস্তে রাজা। পার্লামেন্টের মত নিয়ে মন্ত্রীসভাই সব কাজ করে থাকেন। রাজাকে মাত্র সম্মতি জানিয়ে চল্‌তে হয় এই যা। এখানকার পার্লামেণ্ট বা ব্যবস্থাপক সভা দু'ভাগে বিভক্ত। একটির নাম হাউস অফ্ কমন্স, অন্যটির নাম হাউস অফ্ লর্ডস্। হাউস অফ্ লর্ডসের ক্ষমতা খুবই সামান্য। দেশের সম্ভ্রান্ত লর্ড-বংশীয়দের নিয়েই প্রধানতঃ এই সভা গঠিত হয়েছে। রাজা অবশ্য মন্ত্রীসভার নির্দ্দেশ মত লর্ড উপাধি দিয়ে কয়েকজনকে এখানে পাঠাতে পারেন। হাউস অফ্ লর্ডসের সদস্য সংখ্যা ৭৪০। হাউস অফ্ কমন্স বা গণপ্রতিনিধি পরিষদই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। এখানকার সদস্য সংখ্যা ৬১৫। আইন কানুন, যুদ্ধ-বিগ্রহ সকল ব্যাপারে এর সিদ্ধান্তই চরম। আয়ার্লণ্ড আগে এখানে প্রতিনিধি পাঠাতে পারত। তখন এর সদস্য সংখ্যাও ছিল বেশী। আগেই তোমাদের বলেছি,

রাজাকে বাদ দিলে বর্ত্তমান রিপাব্লিক ও ডিমোক্রাসিগুলি সবই একই ধরণের বলা চলে। আজকাল সঙ্কটজনক ব্যাপারেও রাজার নাম প্রায় শোনা যায় না। প্রধান মন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীর সহযোগে সব সমস্যার মীমাংসা করে থাকেন।

ব্রিটেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। লোকসংখ্যা বাংলাদেশেরই মত, প্রায় পাঁচ কোটি। ইংলণ্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যাণ্ড এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে হ'ল গ্রেট ব্রিটেন। গ্রেট ব্রিটেনকেই আমরা সংক্ষেপে ব্রিটেন বলি। আয়ার্লণ্ড পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি দ্বীপ ; আয়তনে বাংলাদেশের ছোট ছোট দু' তিনটি জেলার মত ; লোকসংখ্যা চল্লিশ লক্ষের বেশী হবে না। একেও আগে ব্রিটেনের সঙ্গে একত্র করে বলা হত। আয়ার্লণ্ডের উপর যে-সব অত্যাচার চলেছিল তা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। যে ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে আনবার জন্য এত চেষ্টা করেছিলেন তিনিই এক সময় এই আয়ার্লণ্ডকে অধীন রাখবার জন্য অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন। প্রায় সাত শ' বছর সংগ্রাম চালাবার পর এখন এ অনেকটা স্বাধীন হয়েছে। ডি, ভ্যালেরা এখন এদেশের অবিসংবাদিত নেতা। আয়ালণ্ডের উত্তর দিক্‌কার ছ'টি জেলা কিন্তু এখনও ইংলণ্ডের সঙ্গে একযোগে চল্‌ছে, এমন কি আয়ারের (প্রায়-স্বাধীন আয়ার্লণ্ডের নূতন নাম) বিরোধিতা করতেও ক্ষান্ত হচ্ছে না। ব্রিটিশের বহু দিনের অবলম্বিত ভেদনীতি বা রাজ্যের মধ্যে

দলাদলি সৃষ্টি করে শাসন চালাবার ব্যবস্থা এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

সাম্রাজ্যের জোরেই ব্রিটেন এত শক্তিমান্। ইংরেজদের কিন্তু ছ' মাসেরও খোরাক জন্মে না নিজ দেশে। এ দেশটি মোটেই কৃষি-প্রধান নয়, এদিকে চেষ্টাও বিশেষ হয় নি। ইংরেজরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে কাঁচা মাল এনে নিজেদের কারখানায় নানা রকম শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করছে, উৎপন্ন দ্রব্যও আবার ঐ সব স্থলে চালান দিচ্ছে। এতে করে তার ধনসম্পদ অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। একটা কথা আজ তোমাদের বলি। আমাদেই দেশে যে-সব পাট জন্মে, বিলেতে পাঠিয়ে তা থেকে নানা মূল্যবান জিনিষ তৈরী করানো হয়। এক টাকার পাটে দশ টাকার মাল উৎপন্ন হয়। আমরা পাট বিক্রয় করে যে দাম পাই তার দশগুণ মূল্য দিতে হয় আমাদের, ঐ পরিমাণ মাল কেনবার সময়। ব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যও এর ফলে ঢের বেড়ে গেছে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রাচ্যে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছে জাপান। অন্যান্য দেশও আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এ কারণ তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কতকটা হানি হয়েছে সত্য, কিন্তু এখনও জগতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বীই রয়েছে। জগতে যত লোক আছে তার প্রধান অংশই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। এক ভারতবর্ষেই আছে প্রায় চল্লিশ কোটি লোক!

অতটুকু ক্ষুদ্র দ্বীপের অতি সামান্যসংখ্যক লোক আজ জগতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী, আর তার শক্তি সামর্থ্যও এখন সকলের শীর্ষে। এত বড় শক্তি সে একদিনে লাভ করতে পারেনি। তোমরা বড় হয়ে এর ইতিহাস পড়বে। স্পেন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই তার রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন সুরু হয়! স্পেন, পর্তুগাল, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকেই একে একে হটিয়ে দিয়েছে সে। এখন এদের সঙ্গে আর বিরোধ নেই। এদের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কের কত বড় একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। গত দু' তিন বছরে স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের সময় তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কতকটা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে আবার তাকে হাত করবার চেষ্টা চল্‌ছে। ওদের সকলেরই কিন্তু কিছু না কিছু সাম্রাজ্য আছে। নিজ দেশের আভ্যন্তরিক শাসন যেরূপই হোক, সাম্রাজ্য রক্ষা ব্যাপারে ব্রিটেনেরই আঁচল ধরে আজ ওরা চল্‌ছে। নূতন করে যে-সব সাম্রাজ্যওয়ালার উদ্ভব হয়েছে সেই ইটালী, জার্ম্মাণী ও জাপানের সঙ্গেই ব্রিটেনের এখন মত বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা। আজ যেন এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হতে চাইছে অতি দ্রুত। এজন্যই ব্রিটেন আজ অত বিরাট আয়োজন সুরু করে দিয়েছে।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্য নানা স্থানে ছড়ানো রয়েছে, তাই একে রক্ষা করার অসুবিধাও ঢের। ব্রিটেন বরাবর কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে চলেছে, আর একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করতেও চায়নি কখনো। গত মহাসমরেও এই পন্থাই অবলম্বিত হয়েছিল। ইউরোপে যখন লড়াই চল্‌ছে তখন এশিয়ার প্রধান শক্তি জাপান তার বন্ধু! আজ কিন্তু এর পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা সব জায়গায়ই তার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন, গত সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিক চুক্তি করতে ব্রিটেন যে বাধ্য হয়, তার প্রধান কারণ, পূব দিক থেকে জাপান আর পশ্চিম দিকে ইটালী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হবার খুবই সম্ভাবনা হয়েছিল। জাপান চীনের ভেতরে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আবার ইটালীও একেবারে ভারত মহাসাগরের তীরে এসে পৌঁছেছে! কাজেই ব্রিটেনকে এখন সব দিক সামলাবার জন্যই চেষ্টা করতে হচ্ছে খুব।

ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের বর্ত্তমান সম্বন্ধ কিরূপ তা একবার দেখা যাক্। এ সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের কথা প্রসঙ্গে অনেক কিছু তোমরা জান্‌তে পেরেছ। আগেই বলেছি, সর্ব্বত্র তার শত্রু বেড়ে যাবে সে তা মোটেই চায় না। এ জন্য তার চেষ্টাও চলছে খুবই গত কয়েক বছর ধরে। এ প্রসঙ্গে একটু পুরণো কথা তোমাদের শোনাতে হবে।

এক সময়ে সাম্রাজ্যওয়ালা রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অনেক লড়াই হলেও এখন সে তাদের সঙ্গে খুবই আঁতাত করে নিয়েছে, একটু আগে বলেছি। নূতন করে কেউ তার শক্তির পথে না দাঁড়ায় এটাই হয়েছে তার এখন প্রধান লক্ষ্য। রুশিয়া কিন্তু এক সময়ে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। ইউরোপে জার্ম্মাণী ও তুর্কী আর এসিয়ায় জাপানের সঙ্গে মিতালী করে রুশকে ঠেকিয়ে রেখেছে বরাবর। পরে যখন পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে রুশিয়া জাপানের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কাছে হেরে গেল তখন থেকে তাকে ভয় করবার আর কোন কারণ রইল না। জাপানের সঙ্গে কিন্তু ব্রিটেনের মিত্রতা আরও পাকা হয়ে গেল। ওদিকে ইউরোপে নূতন শক্তি দেখা দিল জার্ম্মাণী। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইটালীর সঙ্গে সন্ধি করে ব্রিটেনের শক্তিমূলে ঘা দেবার আয়োজন করল সে। ব্রিটেন কাল বিলম্ব না করে ফ্রান্স ও রুশিয়ার (যে রুশিয়া ছিল একদিন তার পক্ষে জুজু) সঙ্গে সন্ধি করে নিল জার্ম্মাণীকে ঠেকাবার জন্য। এই রেষারেষির ফলেই হ'ল গত মহাসমর। তোমরা বুড় হলে "Balance of Power" বা 'শক্তির সমতা' নামে একটি কথা পাবে। ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ইউরোপে এই শক্তির সমতা বজায় রাখা। এজন্যই রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর সঙ্গে তাকে পর পর বোঝাপড়া করতে হয়েছিল। এই নীতি আজকের নয়, বহুদিনের পুরণো।

যুদ্ধে যখন জার্ম্মাণী হেরে গেল, আর রুশিয়ায় বিপ্লব দেখা দিল তখন আগেকার মত শক্তির সমতা রক্ষা করার আর বিশেষ প্রয়োজন রইল না। অনেকেই তখন রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য হয়েছে। তখন কথা উঠ্‌ল সকলে মিলে মিশে সমষ্টিগত ভাবে নিজেদের রক্ষা করে চলবে। এর নাম দেওয়া হ'ল "Collective Security" অর্থাৎ সমষ্টিমূলক নির্ব্বিঘ্নতা। কোন রাষ্ট্র অন্য কোন রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীকে সংঘের সভ্যগণ সমবেতভাবে বাধা দিবে—ও কথাটির এ-ই হ'ল প্রকৃত ব্যাখ্যা। এতে তখন অনেকেরই প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। অনেক দুর্ব্বল অথচ স্বাধীন রাষ্ট্র এর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হ'ল এই আশায় যে, ভবিষ্যতে কোন প্রবল রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হলে সে অন্যদের সাহায্য পাবে। আবিসিনিয়া, আফগানিস্তান বা চীন এই ভেবেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য হয়েছিল। বৃটেনও এই নীতি মেনে নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে সম্মেলনও ডাকা হয় অনেকবার—প্রবল রাষ্ট্রগুলির নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও রণসম্ভার কমাবার জন্য। কিন্তু যে উপায়ে ঐ নীতি কার্য্যকর হতে পারে তার চেষ্টা ব্রিটেন মোটেই করলে না। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে ব্রিঁয়ার রাষ্ট্র-সংঘের সৈন্যবাহিনী গঠন বা ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাবে কর্ণপাতই করলে না। পরে আবার পশুশক্তি প্রবল হয়ে উঠ্‌ল,—রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ সুরু হ'ল। জাপান কর্ত্তৃক চীনের মাঞ্চুরিয়া অধিকারের

সময় থেকেই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল যুগ সুরু হ'ল। জার্ম্মাণীর রাষ্ট্র-সংঘ ত্যাগ ও ভের্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলি একে একে ভঙ্গ করা, ইটালীর আবিসিনিয়া অধিকার, স্পেনের অন্তর্বিপ্লব, জাপানের চীন অভিযান, চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা বিলোপ সকলই এই বিশৃঙ্খল যুগকে ক্রমশঃ জটিল করে তুলেছে। রাষ্ট্র-সংঘের নাম এখন বড় একটা শোনা যায় না।

ব্রিটেন এখন আবার তার পূর্ব্বনীতিতে ফিরে যেতে চাইছে। সমষ্টিমূলক নির্ব্বিঘ্নতার দোহাই দিয়ে আর চল্‌ছে না, শক্তির সমতা বিধান করা তার এখন অধিকতর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জার্ম্মাণী-জাপান-ইটালীর জোট ভেঙ্গে দেবার জন্য সে চেষ্টা করছে। জার্ম্মাণীর সঙ্গে সে ভাব রেখে চল্‌তে চেয়েছিল। গত ১৯৩৫ সালে উভয়ের মধ্যে নৌচুক্তিও ঠিক করা হ'ল। কিন্তু হিটলার ব্রিটিশের অনুকুল মনোভাবের সুযোগ নিয়ে নিজ শক্তি বাড়িয়েই নিয়েছেন। ব্রিটেন ইদানীং ফিরেছে ইটালীর দিকে। ব্রিটেন ও ইটালীতে কত যুগ যুগান্তের প্রীতির সম্বন্ধ। কোন্ কালা আদমি হাব্‌সি এসে তাদের এ সম্পর্কে বাদ সেধেছে! মিঃ চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রীর মসনদে বসেই মুসোলিনীর সঙ্গে সন্ধির কথাবার্ত্তা সুরু করে দিলেন। স্পেন-বিপ্লব প্রথমে এ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সব বাধাই অতিক্রম করা হ'ল। গত নবেম্বর মাসে (১৯৩৮) উভয়ের ভেতর সন্ধি পাকা হয়ে

গেছে। ব্রিটেন ইটালীর আবিসিনিয়া-বিজয় স্বীকার করেছে, ভূমধ্যসাগরে ও লোহিতসাগরে তার অধিকার মেনে নিয়েছে, তাকে টাকাও ধার দেবার কথা হয়েছে! মুসোলিনী কিন্তু হিটলারের মতই এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি এর সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সের কয়েকটি স্থানের উপর কর্ত্তৃত্ব দাবি করে বস্‌লেন! আগেই তোমরা একথা জেনেছ। ব্রিটেন এর পরে ফ্রাঙ্কোর দিকে নজর ফিরিয়েছে। ফ্রাঙ্কোকে হাত করতে পারলে হয়ত মুসোলিনীকে কোন রকমে ঠেকানো যাবে। তাই স্পেনে ফ্রাঙ্কোর কর্ত্তৃত্ব ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে মেনে নিয়েছে! ফ্রাঙ্কোর মতিগতি কিরূপ হবে তা এখনও জানা যায় নি। ব্রিটেন এইরূপে শক্তির সমতা রক্ষায় অত্যন্ত সচেষ্ট হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রণসম্ভার বৃদ্ধির দিকেও খুবই মন দিয়েছে। হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের পর থেকেই শক্তির সমতা রক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে খুবই বেশী। এজন্য, যে রুশিয়াকে শত হস্ত দূরে রেখে সে সর্ব্বদা কাজ করে এসেছে তার সঙ্গেও আজ মোলকাত সুরু করে দিয়েছে! ব্রিটেন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সম্প্রতি আত্মরক্ষামূলক চুক্তি হয়ে গেছে! ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রকে আজ নিজ কোলে টান্‌ছে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও বিপন্ন রাজ্যগুলিকে অভয়বাণী দিতে কসুর করছেন না।

—তিন—

সোভিয়েট রুশিয়া

আগেই তোমাদের একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি। সোভিয়েট রুশিয়াও একটি গণতন্ত্র, তবে ফ্রান্স বা ব্রিটেনকে আমরা যে ধরণের গণতন্ত্র বলে থাকি এ কিন্তু সে ধরণের নয়। আমরা যে-শ্রেণীর গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত তাতে একাধিক দল থাক্‌বে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রীসভা গঠন করে দেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করবে। সোভিয়েট রুশিয়ায় কিন্তু জার্ম্মাণী ইটালীর মতই একটির বেশী দল নেই। এবং যদিও দু' বছর পূর্ব্বে সেখানে একটি নূতন শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়েছে তথাপি একে ও-ধরণের গণতন্ত্র এখনও পুরাপুরি বলা চলে না। সেখানে আজও কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দলই দেশ শাসন কর্‌ছে। অন্য কোন দলের অস্তিত্ব এখনও সেখানে স্বীকৃত হয় না। সোভিয়েট রুশিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'সম্মিলিত স্বাধীন রুশ সোভিয়েট রিপাব্লিক'। এগারটি ছোটখাট রিপাব্লিক নিয়ে এই বিরাট রিপাব্লিক গঠিত। এখানে একটি দলের প্রাধান্য হলেও জনসাধারণের মঙ্গলের ভিত্তিতেই এ শাসন প্রতিষ্ঠিত। ধনী, জমিদার, অভিজাত ও পুঁজিদারএ শুধু অস্বীকার করে না, সমস্ত সম্প্রদায় উচ্ছেদ করে, সমাজে ও শাসনে শ্রমিক জন-মজুরদের প্রাধান্য স্থাপনই

এর মূল লক্ষ্য। গত বাইশ বছর পর্য্যন্ত রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দলের নেতারা এই উদ্দেশ্যে কার্য্য করে এসেছেন। তাঁরা অনেকটা সাফল্যও লাভ করেছেন। এজন্য কিছুকাল পূর্ব্বে একটি গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রবর্ত্তনের আয়োজন করা হয়েছে।

ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রমুখ গণতন্ত্রগুলি কিন্তু প্রথমে একে একেবারে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পরে যখন দেখ্‌লে একে ধ্বংস করা অসম্ভব তখন এর সঙ্গে নানারকম সন্ধি ও চুক্তি কর্‌তে থাকে। মনে মনে কিন্তু তারা একে ঘৃণা করত, আর এ থেকে শত হস্ত দূরে থাক্‌তে চেষ্টা করত। কেননা, তারা গণতন্ত্র শাসনের ভক্ত হলেও এটা চায় না যে, ধনী ও অভিজাত সমাজ দেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যাক্। শাসনভার যাদের উপর ন্যস্ত তাদের অধিকাংশই বংশ পরম্পরায় পুঁজিদার সমাজ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। কাজেই তারা যে রুশিয়ার নূতন ধরণের গণতন্ত্রের বিরোধী হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতা গত বিশ বাইশ বছরে নানা আকার ধারণা করেছে। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বোলশেভিকরা রুশিয়ায় রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। জার্ম্মাণীর পতন ও হেবর্সাই সন্ধি হয়ে যাবার পর মিত্রশক্তিরা রুশিয়ার এই নূতন শাসনতন্ত্র উচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু রুশ জনসাধারণ তখন নূতন মন্ত্রে উজ্জীবিত

হয়েছে। স্বাধীনতার আস্বাদ তারা পেয়েছে, তাদের মেরুদণ্ডও এর মধ্যে খুবই শক্ত হয়ে গেছে। ব্রিটিশ, ফরাসী, ইটালিয়ান, পোল, চেক, জাপানী, বিদ্রোহী সাদা রুশ চারদিক থেকে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু ট্রট্স্কি নামে আর একজন প্রধান বোলশেভিক নেতা জাতীয় সেনাদলকে নিপুণভাবে পরিচালনা করে সকলকেই একে একে হটিয়ে দিতে সক্ষম হলেন!

একদিকে যখন শত্রু বিতাড়ন কার্য্য চল্ল, অন্যদিকে তখন লেনিন শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রিত কর্তে লাগ্লেন। তিনি যে নীতির দোহাই দিয়ে জয়লাভ করেছেন তার নাম সাম্যবাদ। মানুষের ধনগত বৈষম্য লোপ করে সকলকে এক শ্রমিক পর্য্যায়ে ফেলতে হবে—সাম্যবাদের এই হ'ল মূল কথা। লেনিন শাসন ভার হাতে নিয়ে দেখ্লেন, এ উদ্দেশ্য এক দিনে সিদ্ধ হবার নয়। তাই তিনি ধনিক ও জমিদার অভিজাতদের উচ্ছেদ করে দিয়েও ভূমি একেবারে সরকারে বাজেয়াপ্ত করলেন না, কিছু সরকারের হাতে রেখে বেশীর ভাগই জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। রুশিয়ার মধ্যবিত্ত কৃষক সম্প্রদায়ের নাম 'কুলক'। তাদের গায়ে তিনি হাত দিলেন না। দেশের সর্ব্বপ্রকার খনিজ ও ভূমিজ সম্পদ সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য একটা পরিকল্পনা চালু করলেন। তার নাম দিলেন 'নিউ ইকনমিক পলিসি' (সংক্ষেপে N. E. P.) বা নূতন আর্থিক সংস্থা। ১৯২৪ সালের আরম্ভেই লেনিন মারা গেলেন। তাঁর অন্যতম

যোগ্য সহচর ষ্টালিনের উপরই সব দায়িত্ব পতিত হ'ল। ট্রট্স্কি ছিলেন লেনিনের দক্ষিণহস্ত। অনেকে ভেবেছিলেন, লেনিনের পর ট্রট্স্কিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন। কিন্তু ট্রট্স্কি তা হতে পারেন নি, ষ্টালিনই হয়েছেন। ট্রট্স্কি ও ষ্টালিনের ভেতর বিরোধ অনেক দূর গড়িয়েছে। ট্রট্স্কি দেশত্যাগী, মেক্সিকোতে প্রবাস জীবন যাপন করছেন। তিনিও একজন বিরাট পুরুষ।

ষ্টালিনের সঙ্গে ট্রট্স্কির বিরোধ কোথায় তার একটু আভাষ তোমাদের দিয়ে রাখছি। লেনিন যা চেয়েছিলেন, ট্রট্স্কি ষ্টালিনও তাই চান,—জগতের সর্ব্বত্র সাম্যের ভিত্তিতে গণশাসন প্রবর্ত্তিত করতে হবে। কিন্তু এর উপায় সম্বন্ধে এদের ভেতর গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। ট্রট্স্কি বলেন, জগতের সর্ব্বত্র এ প্রথা এখনই চালু করতে হবে, নইলে রুশিয়ায় এ দৃঢ় ও পাকা হবে না। ষ্টালিন বলেন, তা নয়, প্রথমে রুশিয়ায় সাম্য-শাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করা দরকার, তবেই অন্যত্র এ শীঘ্র শীঘ্র প্রবর্ত্তিত হতে পারবে। লেনিনেরও নাকি এই মত ছিল। এ কারণ ষ্টালিন একে একটি সাম্যমূলক গণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তিনি দু-দুবার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেছেন। প্রথম বারের মেয়াদ শেষ হয় ১৯৩২ সালে, আর দ্বিতীয়টী শেষ হয় গত ১৯৩৭ সালে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও সমবায় রীতিতে ভূমির খনিজ দ্রব্য আহরণ,

শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বত্র বিদ্যুৎশক্তির প্রচলন, রাস্তাঘাট ও রেলপথ বিস্তার, ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও বেকার সমস্যার সমাধান—এ বিষয়গুলি ছিল প্রথম পরিকল্পনার অঙ্গ। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বছর খুব কাজ চল্‌ল। এর সাফল্য সম্বন্ধে কিন্তু অনেক মতভেদ আছে। তবে কাজ যে দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে শস্য উৎপাদনে অনেক ব্যাঘাত ঘটল। আর এর মূলে ছিল রুশিয়ার কুলক সম্প্রদায়। তারা নূতন ব্যবস্থা পছন্দ করেনি। কাজেই ইচ্ছা করেই তারা আশানুরূপ শস্য জন্মাল না। ফলে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া চারদিক ছেয়ে ফেল্‌ল। দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সুরু হলে ষ্টালিন এর শোধ তুললেন। তিনি প্রায় আড়াই লক্ষ কুলককে সাইবেরিয়া নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে এদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দিলেন! দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ফুরালে দেখা গেল এবারে রুশিয়া আশ্চর্য্যরকম উন্নতি করেছে। রুশিয়ার ধনসম্পদও আজ অফুরন্ত। সেখানে বেকার একজনও নেই। শতকরা নব্বই জন শিক্ষিত। সংবাদপত্র ও তার পাঠক আজ রুশিয়ায় অগণিত। থিয়েটার, রেডিও, বায়োস্কোপের আয়োজন খুবই সেখানে। আর এসবই সরকার থেকে করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, বা সম্প্রদায়-

গত স্বার্থ সেখানে কিছুই নেই। বিজ্ঞানেও রুশিয়া খুবই উন্নতি করছে। বহু বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ হয়েছে সেখানে। ষ্টালিন বড় বড় বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করেছেন সুমেরু আবিষ্কারের জন্য। সুমেরু বরফের দেশ, বরফ ছাড়া আর যে কিছু থাক্‌তে পারে সেখানে তা কেউ কল্পনাও করে নি। রুশ বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে কয়লা খনি ও স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেছেন! এর পরিমাণও নাকি বিস্তর। বরফ সরিয়ে কৃষিকাজও সেখানে করা চল্‌বে!

গোড়াতেই রুশিয়ার নূতন শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছি। এতকাল রুশিয়ায় রিপাব্লিক বা গণতন্ত্রের নামে কম্যুনিষ্ট পার্টি বা সাম্যবাদী দল দেশ শাসন করত। ষ্টালিন এ দলের জেনারেল-সেক্রেটারী বা সাধারণ সম্পাদক। তাঁর হাতেই কিন্তু দেশ শাসনের চাবি কাঠি! প্রায় বিশ বছর ধরে সাম্যবাদের আদর্শে সতর কোটি রুশ পরিচালিত হয়েছে! এদের ভেতরে উন্নত সভ্য থেকে আরম্ভ করে আদিম বর্ব্বর জাতির লোকও বিস্তর রয়েছে। সাম্যবাদের আদর্শেই, কিন্তু এরা সকলে পরিচালিত। যখন দেখা গেল, এদের হাতে শাসনভার অর্পিত হলে আদর্শচ্যুত হবার আশঙ্কা নেই তখন গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা সুরু হ'ল। সোভিয়েট কংগ্রেসে অনেক আলোচনা ও বিতর্কের পর গত ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সাম্যবাদের আদর্শে গণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত

হয়। এ ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'ষ্টালিন কনষ্টিটিউশ্যন'। কারণ এর ভেতরে ষ্টালিনের হাত রয়েছে যথেষ্ট। সমগ্র রুশিয়াকে এগারটি রিপাব্লিকে বিভক্ত করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রের প্রথম দফায়ই বলা হয়েছে, "সোভিয়েট রুশিয়া একটি শ্রমিক ও কৃষকের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র"! কাজেই দেখতে পাচ্ছ শ্রমিক ও কৃষক ছাড়া অন্য কারুর এতে স্থান নেই। সমগ্র দেশের উপর যে পার্লামেণ্ট গঠিত হয়েছে তাতে প্রতি তিন লক্ষ লোকে একজন করে প্রতিনিধি থাক্‌বার ব্যবস্থা হয়েছে। এর উপর একটা উচ্চতন পরিষদ আছে। রিপাব্লিক ছাড়া কয়েকটি স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন রাষ্ট্রও এখানে রয়েছে। প্রত্যেক রিপাব্লিক ও স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন অঞ্চল থেকে এখানে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য পাঠানো হয়। আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করবার ও দেশ-শাসনের ভার এখনও মন্ত্রীসভারই উপর। মন্ত্রীসভার নাম হ'ল 'কাউন্সিল অফ্ দি পিপ্‌লস্ কমিসার'। একে কিন্তু এখনও কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকটেই জবাবদিহি করতে হয়। বর্ত্তমানে গণতন্ত্রমূলক শাসন স্থুরু হলেও রুশিয়া আজও ষ্টালিনের নির্দ্দেশেই চল্‌ছে বল্‌তে হবে।

কে মিত্র কে শত্রু রুশ নেতারা অনেক আগেই তা জান্‌তে পেরেছেন। জগতের প্রায় সব দেশই তাঁদের উপর খাপ্পা, সাম্যবাদমূলক শাসন সেখানে চালু হয়েছে বলে। এজন্য অনেক

আগে থেকেই দেশ-রক্ষার আয়োজন তাঁরা সুরু করে দিয়েছিলেন। রুশিয়ার সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। আজ এক কোটি ত্রিশ লক্ষ সৈন্য সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত! বিমান-পোতেও সে অনেকের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। পূর্ব্বে পশ্চিমে দু' দিকেই তার শত্রু। এজন্য দ্রুত সৈন্য চলাচলের জন্য নূতন ধরণের 'ডবল ট্র্যাক' বা সমান্তরাল ভাবে দুটি রেলপথও নির্ম্মাণ করা হয়েছে সাইবেরিয়ার দিকে। নূতন ব্যূহও ওখানে তৈরী হয়েছে। স্থলসৈন্য, বিমানপোত ও নৌবহর বিস্তর মজুত আছে। ষ্টালিন মত-বৈষম্যের জন্য অনেকগুলি বড় বড় সেনাধ্যক্ষকে সরিয়ে দিয়েছেন। বিচারে কারো কারো মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, কারো কারো বা হয়েছে দীর্ঘকালের নির্ব্বাসন। কেউ কেউ বলেন, রুশিয়ার সামরিক শক্তি এতে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ষ্টালিন কিন্তু বল্‌ছেন, এ কথার ভেতরে সত্য এতটুকুও নেই।

রুশিয়ার উপর জগতের অধিকাংশ রাষ্ট্রই কেন বিরূপ হয়েছে আগে বলেছি। ব্রিটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্র হলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বৈ তো নয়। কাজেই তারাও কম বিরূপ নয়। বিপ্লবের অবসান হ'লে রুশিয়া যখন চারদিকে তার আদর্শ প্রচার করতে সুরু করে তখন ব্রিটেনই তাকে বিশেষভাবে বাধা দেয়। ইটালী, জার্ম্মাণী ও মধ্য ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ভেতরে সাম্যবাদ যে প্রচলিত হয়নি তা তারই চেষ্টায় বল্‌তে হবে।

মার্শাল চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াংকাইশেক

জাপান-সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশের সেতু
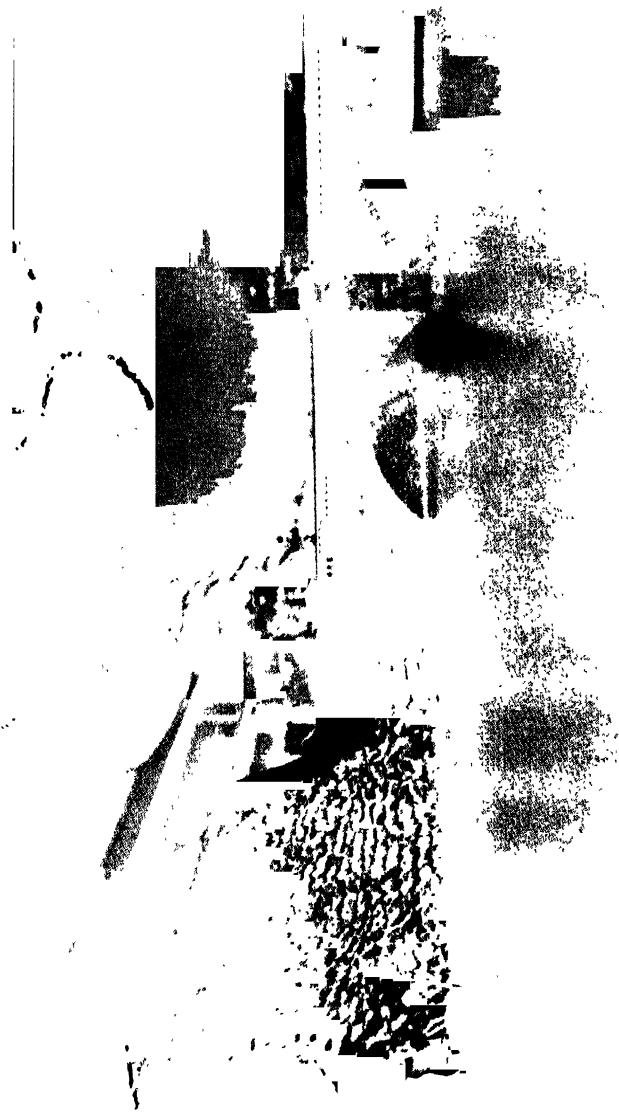
ভারতবর্ষেও এক সময়ে সাম্যবাদ মাথা তুলতে চেয়েছিল। এখানকার গবর্ণমেণ্ট তা অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেয়। ইদানীং আবার এদেশে সাম্যবাদের কথা শোনা যাচ্ছে। ষ্টালিনের আমলে রুশিয়া যখন আস্তে আস্তে পররাজ্য-প্রবেশ নীতি পরিহার করলে তখন থেকে ব্রিটেন কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু এ যে আবার মাথা তুলে উঠ্‌বে না—তার কি নিশ্চয়তা আছে? তাই ভবিষ্যতেও একে বাধা দেবার জন্য সে ইটালী থেকে জার্ম্মাণী পর্য্যন্ত একটি পাঁচিল তুলে রাখ্‌তে চেয়েছিল। এ পাঁচিলের মালিক হলেন মুসোলিনী ও হিটলার। বিশেষজ্ঞদের দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রিটেনের সহায়তা না পেলে ফাসিজ্‌ম্ এমন করে মাথা তুলতে পারত না। ফাসিষ্ট নেতাদের কথা থেকেই বুঝা যায়, তাঁরা ব্রিটিশের ঐরূপ মনোভাবের সুযোগ নিয়েই নির্ব্বিঘ্নে এত শক্তিশালী হতে পেরেছেন। সাম্যবাদ তাঁরা নির্ম্মূল করতে চান,—স্থানে অ-স্থানে এই কথাই তাঁরা বলে থাকেন। স্পেনে ফ্রাঙ্কোকে তাঁরা যে জয়যুক্ত করে তুলেছেন, আর চেকোশ্লোভাকিয়ার যে নিপাত সাধন করেছেন তাও এর দোহাই দিয়েই করা হয়েছে! তাঁরা কিন্তু আজ তাঁদের হিতৈষীদের দিকেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ব্রিটেন এতদিন দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছে! আজ কিন্তু এর সত্যতা বেশ প্রতীত হচ্ছে। হিটলার, মুসোলিনীর আক্রোশ ব্রিটেন প্রমুখ গণতন্ত্রগুলির উপর বেড়েই চলেছে

ইদানীং! জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান রুশিয়াকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে—মাঝে মঝে একথা প্রকাশ করে থাকে, আর এই চেষ্টা করার অছিলায় রণসম্ভারও তারা বাড়িয়ে নিচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ্য কিন্তু আজ ধরা পড়ে গেছে। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যে ভাগ বসানই তাদের মূল লক্ষ্য।

রুশিয়ার প্রতি উক্ত তিনটি রাষ্ট্রের মনোভাব খুবই স্পষ্ট। ব্রিটেনের মনোভাবও বুঝতে কখনো কষ্ট হয়নি। ফ্রান্স কিন্তু রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে ছিল। জার্ম্মাণীতে হিটলারের অভ্যুদয় হলে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য ফ্রান্স যে-সব আয়োজন করেছিল ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি বা সন্ধি তার ভেতরে একটি। কিন্তু কালচক্রে ব্রিটেনের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করতে বাধ্য হওয়ায় তাকে রুশিয়ার দিক হতেও আজ মুখ ফেরাতে হয়েছে। এখন কিন্তু ব্রিটেনই আবার রুশিয়ার সহায়তা প্রার্থী হয়েছে!

সোভিয়েট রুশিয়ার পররাষ্ট্র-নীতি কিরূপ দাঁড়িয়েছে তা এ সময় আমাদের জেনে রাখা দরকার। রুশ-বিপ্লবের পরে মাঝে মাঝে কোন কোন রাষ্ট্র রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ও সন্ধি করলেও বিশ্ব-দরবারে সে আসন পেল গত ১৯৩৫ সালে। রাষ্ট্র-সংঘে সে এ সময় প্রবেশ করল। পররাষ্ট্র-নীতিতে তার দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয়ও পাওয়া যায় এ সময় থেকে। সে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃখ রাষ্ট্র-সংঘের সভ্যগণকে তখন থেকে প্রত্যয়

করাতে চেষ্টা করে যে, অন্যদেশে সাম্যবাদমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা সে ত্যাগ করেছে। এ ঘোষণা ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তির জন্য কম দায়ী নয়। জাপ-জার্ম্মাণ চুক্তি ঐ চুক্তিরই জবাব বলে মনে হয়। জাপ-জার্ম্মাণ চুক্তির কথা জাপান প্রসঙ্গে তোমাদের বল্‌ব। রাষ্ট্র-সংঘে ইটালীর বিরুদ্ধে আর্থিক শাস্তি দানের যে ব্যবস্থা হয় তার জন্যও, সোভিয়েট কম দায়ী ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তার আর একটি জিনিষ ধরা পড়ে গেল,—বুঝা গেল, রুশিয়ায় সাম্যবাদ-মূলক শাসন স্থাপিত হলেও জাতীয় স্বার্থ রুশরাও অন্য কারো চেয়ে কম করে দেখে না। যখন ইটালীর নিকট তৈল বিক্রয় বন্ধ করবার প্রস্তাব হ'ল তখন অন্যান্যের সঙ্গে সে-ও এতে আপত্তি জানাল! তৈল যে রুশিয়ার একটি বড় সম্পদ। বিক্রী বন্ধ হয়ে গেলে ভয়ানক আর্থিক ক্ষতি হবে তার! অথচ একমাত্র এই কারণেই সমস্ত শাস্তিদান ব্যবস্থা অকেজো হয়ে গেল। আধুনিক যুদ্ধে তৈল না হলে চলে না। তৈল না পেলে ইটালী বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করত,—অবিসিনিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয় হত না,—জগতের রাষ্ট্র-নীতির গতিও বদলে যেত। ওদিকে আবার স্পেনে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হতে না হতেই বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। ইটালী ও জার্ম্মাণী সাম্যবাদকে বাধা দেবার ছিলা করে বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে লাগল।

সোভিয়েট রুশিয়া প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করল বটে, কিন্তু শেষে দেখা গেল সে সরে দাঁড়িয়েছে! অবশ্য ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জন্যই হয়ত অত তাড়াতাড়ি তাকে হাত গুটাতে হয়েছিল। তবে এ দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে যে, সে এখন জাতীয়তাকেই বড় করে দেখছে।

সোভিয়েট রুশিয়া বাইরের ব্যাপারে যেন আর লিপ্ত হতে চাইছে না। চীন-জাপান সংঘর্ষেও তা-ই প্রমাণিত হচ্ছে। সোভিয়েট কিন্তু এর আরম্ভেই চীনের সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে একটা চুক্তি করে নিয়েছে। এ একেবারে ব্যবসামূলক চুক্তি, 'ফেল কড়ি, মাখ তেল' গোছের! চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষার জন্য রাষ্ট্র-সংঘের সব সভ্যই দায়ী। কিন্তু ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়া তার সঙ্গে আলাদা সন্ধি করে এ দায়িত্বভার বেশী করেই ঘাড়ে নিয়েছিল। কিন্তু সময় কালে তারা সরে পড়ল! চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার থেকে আর একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝা গেছে,— সাম্রাজ্যবাদীরা তখনও সোভিয়েট রুশিয়ার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছিল না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স লড়াই করলে ইটালী ও জার্ম্মাণীকে দমন ব্যাহত করা যেত, কিন্তু শেষে তাদের নিজ নিজ দেশেই হয়ত সাম্যবাদ মাথা নাড়া দিয়ে উঠবে—তাদের এ ছিল আশঙ্কা! মিউনিক চুক্তির সময় তাই তাকে একেবারে দূরেই রাখা হ'ল।

এখন কিন্তু আবার রুশিয়াকেই তোয়াজ করতে লেগে গেছে—যাতে ভাবী সমরে ইটালী-জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে তাদের পক্ষ হয়ে সে যুদ্ধ করে।

রুশিয়া কিন্তু প্রাণপণে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রই হতে চাইছে এখন। নিজের উন্নতি তার মূল লক্ষ্য।...ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্ভবপর হয়ে উঠেছে এখন। ইউরোপের সমস্যার অন্ত নেই। জার্ম্মাণী ফের গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোলাণ্ড ও রুশিয়া—এই চারটি গণতন্ত্র মিলে জার্ম্মাণীকে বাধা দিতে পারবে কি না তা নিয়ে আলোচনা চল্‌ছে। ষ্টালিন বলেছেন, জার্ম্মাণ ও রুশদের ভেতর যাতে যুদ্ধ বাধে ব্রিটেন এই চেষ্টাই করে আসছে কিছুকাল যাবৎ। কাজেই কেমন করে ব্রিটিশকে বিশ্বাস করা যাবে? তবে ইউরোপ ও এশিয়ায় উভয়ের স্বার্থই ইটালী, জার্ম্মাণী ও জাপানের হস্তে সমানভাবে বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। এদের ভিতরে মিলন হলে তা সাধারণ শত্রু বিতাড়নের জন্যই হবে, অন্য কোন কারণে হবে না।

সাম্রাজ্যবাদ ও স্বাধীনতা

—এক—

চীন

ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়ে রয়েছে সোভিয়েট রুশিয়া। তার পূব-দক্ষিণে রয়েছে চীন ও জাপান। চীন আবার ভারতবর্ষেরও পূব সীমায় এসে ঠেকেছে। কাজেই সোভিয়েট রুশিয়া ও ভারতবর্ষের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে খুব। চীনের নিজস্ব সভ্যতা বহু প্রাচীন। তথাপি নূতনকে গ্রহণ করতে সে কখনো কার্পণ্য করেনি। ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মকে সে একদিন সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। আবার আজকের দিনে রুশিয়ায় যে নব-নীতির পরীক্ষা চল্‌ছে তাকে পরখ করে নিতেও চীনেরা কসুর করেনি। নূতনের প্রতি অনুরাগ তার বহুদিনের। এ অনুরাগ এখনও বজায় আছে।

আজ চীনের কথা বলতে গেলেই চীন-জাপান লড়াইয়ের কথা মনে পড়ে। গত দেড় বছরের বেশী এ লড়াই চল্‌ছে।

আরও কতদিন চলবে তার ঠিক নেই। যতই দিন যাচ্ছে ততই দুটি কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়ছে। চীন তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছে, স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক ক্ষতি নেই, তবু সে কারো অধীন হবে না। আর জাপান চাইছে সাম্রাজ্য। চীন দখল করতে পারলে তার সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠ্‌বে না। তার সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে আজ সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। চীন জাপানে লড়াই হ'ল স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ। এ কথাটি তোমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

চীন যুগে যুগে পরাধীন হয়েছে। আবার পরাধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতাও সে অর্জ্জন করেছে। তার স্বাধীন মনোবৃত্তি কখনো লোপ পায়নি। মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ করে বিগত ১৯১২ সালে, চীন স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। এবারকার আন্দোলনের মূলে ছিলেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করে তিনি ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসা না করে জাতির চিকিৎসায়ই আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সব রোগের মূল হ'ল পরাধীনতা। তিনি মাঞ্চু-সম্রাটের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করেন। দ্বাদশ বারে তিনি দেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হন। কিন্তু চীনের সমস্যা বড়ই জটিল। চীনাদের মধ্যে মত-বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। সান দেখ্‌লেন, ঐক্য প্রতিষ্ঠা

না হলে চীনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাই চীন রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট পদ নিজে গ্রহণ না করে ভূতপূর্ব্ব মাঞ্চু সম্রাটের সেনাপতি য়ুয়ান-শি-কাইকে দিয়ে দিলেন! এতেও কিন্তু বিশেষ সুবিধা হ'ল না। যাঁর দৌলতে য়ুয়ান এই উচ্চতম পদ লাভ করলেন তাঁর বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করতে লেগে গেলেন। এ সময় সান জাপানে চলে যান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুমিণ্টাংকে হীনবল করা ছিল য়ুয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য। এর জন্যে চেষ্টাও তিনি কম করেন নি। গত মহাসমরের মাঝখানে ১৯১৬ সালে য়ুয়ান মারা যান। চীন ছিন্ন-বিছিন্ন হয়েই রইল। সান্-ইয়াৎ-সেনের কাজ কিন্তু পূর্ব্ববৎ চলতে লাগ্ল।

মহাযুদ্ধে চীন মিত্রশক্তিদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল, কিন্তু তার প্রতিদানে সে কিছুই পায় নি। পরে যখন রাষ্ট্র-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে এর সভ্যপদ প্রাপ্ত হয়! এখনও চীন রাষ্ট্র-সংঘের সভ্য আছে। যুদ্ধের সময়ই কিন্তু বুঝা গিয়েছিল, মিত্রশক্তিকে সাহায্য করলেও চীনের ভবিষ্যৎ শুভ হবে না। জাপান তখন প্রাচ্যে খুবই প্রবল হয়ে উঠ্ল, অদূর ভবিষ্যতে চীনের উপরই যে তার নজর পড়বে, সকলেই তা ভাল করে বুঝতে পারলে। যুদ্ধের সুযোগে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য সমগ্র এশিয়ায় আগেই বেড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর ভের্সাই সন্ধিতে অনেকটা রাজ্যও সে পেয়ে গেল। ইউরোপ আত্মসংগঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, একারণ জাপানের

সোভিয়েট রুশিয়া
মাঞ্চুকো
চীন
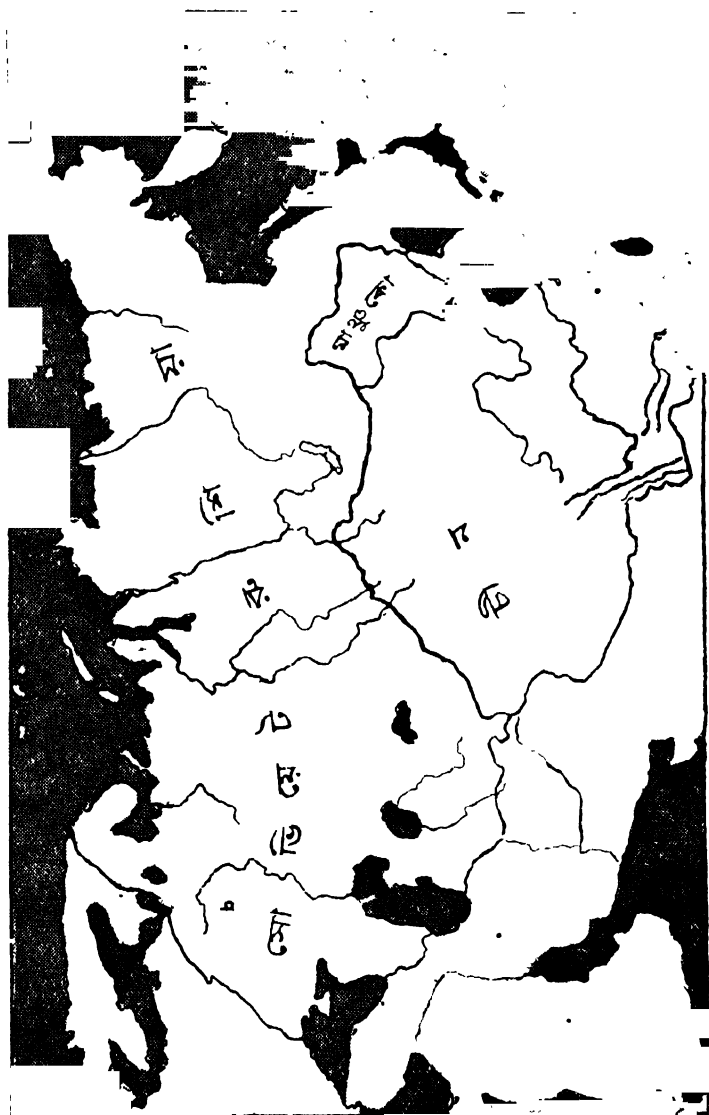
শক্তিবৃদ্ধির দিকে প্রথমে কেউই নজর দিতে পারল না। পরে ও নিয়ে খুবই আন্দোলন উপস্থিত হয়। চীনের উপর জাপানের যে কুমতলব ছিল তাও সকলে বুঝতে পারল। তাই ১৯২১-২২ সালে ওয়াশিংটনে ইউরোপ ও এশিয়ার শক্তিবর্গের মধ্যে যে-সব সন্ধি বা চুক্তি হয়েছিল সে-সবই জাপানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়। চুক্তিগুলির একটির নাম নবশক্তি চুক্তি। চীনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে সকলেই সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে এ-ই ছিল এ চুক্তিটির সার কথা। সকলেই এতে সায় দিলে, জাপানও এ চুক্তি মেনে নিতে তখন বাধ্য হ'ল।

এর পর স্বুরু হ'ল চীনের সংগঠনের যুগ। সান-ইয়াৎ-সেন, চিয়াং কাইশেক ও অন্যান্য যোগ্য সহকর্ম্মীদের সঙ্গে নিয়ে চীন-গঠন কার্য্যে লেগে গেলেন। চীন বিরাট দেশ, এর আয়তন যে কত বড়, সাধারণ চীনবাসী তার খোঁজ খবরও রাখে না। চীনের এক দিক থেকে অন্যদিকে যেতে কি কষ্টই না পেতে হত তাদের। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, মরুভূমি সবই সেখানে রয়েছে। এখনো তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হবে, তিব্বতে যেতে হলে চীনেদের কলকাতা হয়েই যেতে হয়! এদের জনসংখ্যা খুব বেশী, বাইরের অংশ তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া প্রভৃতি বাদ দিলেও খাস চীনের লোকসংখ্যা বিয়াল্লিশ কোটির কম হবে না। এখানকার ধনসম্পদেরও হিসাব নিকাশ করা হয়নি,

আর তা সম্ভবও নয়। তৈল, তুলা, লৌহ, স্বর্ণ, কয়লা, গম, সেগুন কাঠ প্রভৃতি ভূমিজ ও খনিজ জিনিষে দেশটি ভরা। আবাহমান কাল ধরে বিদেশীরা, বিশেষ করে ইউরোপবাসীরা কেন যে এর উপর এত লোভ করেছে তার কারণ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। ওয়াশিংটন চুক্তিগুলির সুযোগ নিয়ে সান-ইয়াৎ-সেন এহেন চীনকে আবার আত্মস্থ ও শক্তিমান করবার জন্য চেষ্টা কার্জ করলেন। চীনের স্বাধীনতা ও শক্তির মূল উৎসগুলি করায়ত্ত করে একে আবার সবল সুস্থ করতে প্রয়াস পেলেন তিনি।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মাণী, রুশিয়া প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত চীন কখনো ভুলতে পারবে না। ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯০০ সালের বক্সার বিদ্রোহ ও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহিংসাবৃত্তি চীনেদের প্রাণে এখনো শেলের মত বিঁধছে। প্রথমোক্ত যুদ্ধে চীন তার কোন কোন অংশ (ফরমোসা দ্বীপ, প্রভৃতি) হারায়। দ্বিতীয় বারে সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের ভেতরে সৈন্য মোতায়েন করবার অধিকার লাভ করে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার কাছ থেকে বন্দরগুলির কাষ্টম্‌স্ বা শুল্ক আদায় ও গ্রহণের ভার প্রাপ্ত হয় তারা। এর পর চীন রিপাব্লিকে পরিণত হ'ল, কিন্তু অন্তর্বিরোধ আগের মতই লেগে থাকায় এসবের কোন প্রতিকারই হ'ল না। ওয়াশিংটন চুক্তির পর সান-ইয়াৎ-সেন এদের

হাত থেকে মুক্তি পাবার আশা পেলেন। ব্রিটিশ, ফরাসী বা জাপানী কাউকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি, কাজেই সে-সব দেশ থেকে বিশেষজ্ঞও তিনি আমদানী করলেন না। তিনি মুখ ফেরালেন রুশিয়ার দিকে।

রুশিয়াও ইতিপূর্ব্বে চীনকে কম নাজেহাল করেনি, কিন্তু এ সময় রুশিয়ার কর্ম্মধারা বদলে গেছে। রুশ সাম্রাজ্য উৎসন্ন হয়ে তখন সেখানে গণ-কর্ত্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত। সান স্বয়ং চীন পুনর্গঠনের জন্য যে নীতি প্রচার করেছিলেন রুশিয়ার সাম্যবাদের সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে। সান বললেন, জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও আর্থিক সাম্য এই তিনটীর ভিত্তিতে চীন-সমাজ পুনর্গঠিত করতে হবে। এ তিনটি কথার একটু ব্যাখা প্রয়োজন। "বিদেশীদের আধিপত্যের সমস্ত সূত্র ছিন্ন করে দিয়ে চীনাদের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।" তিনি জাতীয়তার ব্যাখ্যা করলেন এইরূপ। "চীনের শাসন কার্য্য চলবে গণ-প্রতিনিধিদের দ্বারা পাশ্চাত্যদেশের আদর্শে। পরস্পরের ভেতরে শক্তির তারতম্য থাক্‌লেও সকলেই দেশের সম্পদ যথাসম্ভব ভোগ করতে পাবে," সান এ কথাও ঘোষণা করলেন। তাঁর এ সব কাজে বিপ্লবী রুশদের কাছ থেকেই অধিকতর সাহায্য পাওয়া সম্ভব। তিনি সাহায্য পেলেনও। সান চিয়াং কাইশেককে মস্কো পাঠিয়েছিলেন। জোফে প্রমুখ রুশ বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করে তিনি সৈন্যবিভাগ,

শাসনবিভাগ প্রভৃতি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত কর্তে লাগলেন। ক্যান্টনকে কেন্দ্র করেই এসব কার্য্য চল্‌ল। পরে নানকিঙে নূতন রাজধানী স্থাপিত হ'ল। সানের প্রধান লক্ষ্য ছিল চীনের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের স্ব মতে আন্‌বার জন্য তিনি পিকিঙে গেলেন। কিন্তু এ কাজ বেশী দূব অগ্রসর হবার আগেই তিনি সেখানে মারা যান। চিয়াং কাইশেক সানের বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী ও চীনা বাহিনীর অধ্যক্ষ। তিনিই তাঁর স্থানাভিষিক্ত হলেন। কুমিণ্টাঙেরও নেতা হলেন তিনি।

একটি কথা কিন্তু এখনও তোমাদের বলা হয়নি। রুশ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে একদল চীনা যুবক তখনই চীনে সাম্য-বাদ চালু করতে চেয়েছিল। এরা কুমিণ্টাঙের সভ্য থেকেই আর একটি দল গঠন করে—এ দলের নাম হ'ল কুং চাং টাং। সান যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এ দল মাথা তুলতে পারে নি। তাঁর মৃত্যুর পরও কিছুকাল কুমিণ্টাঙে সকলে মিলে মিশে কাজ করেছিল। কিন্তু দু'বছর পরেই এ দু দলের ভেতরে হ'ল সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। অনেকে মনে করেন, এ বিচ্ছেদ চীনজাতির পক্ষে ভীষণ অমঙ্গলের কারণ হয়েছে!

১৯২৭ সালে এ বিচ্ছেদ ঘটে। এর পূর্ব্বেই চীনেরা বিদেশীর বিশেষ অধিকার অনেকটা খর্ব্ব করতে পেরেছিল। এ নিয়ে ১৯২৬ সালে ব্রিটেন ও চীনের ভেতর যুদ্ধ বাধবারও

উপক্রম হয়েছিল! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আলাপ-আলোচনার ফলে কতকটা মীমাংসা হয়ে যায়। বিদেশীদের স্বার্থ প্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই ছিল। ক্যাপিটুলেশ্যনের কথা তোমাদের অনেকবার বলেছি। চীনে তা ছিল খুবই উৎকট রকমের। এক সাংহাই বাদে আর সব জায়গা থেকেই এসব স্বার্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। সাংহাইয়ে কিন্তু এখনও ব্রিটিশ অঞ্চল, ফরাসী অঞ্চল, জাপানী অঞ্চল রয়েছে। তাদের বিচার আচার নিজ নিজ বিধান অনুযায়ীই হয়ে থাকে। বর্ত্তমানে জাপান, সাংহাইয়ের চীনা অঞ্চলগুলি সবই হস্তগত করেছে।

সাম্যবাদীদের নেতা হলেন মাওৎ-সে তুং, আর নেশ্যনালিষ্ট কুমিণ্টাং দলের নেতার নাম মার্শাল চিয়াং কাইশেক। কুমিণ্টাং দলে অতঃপর চিয়াং কাইশেকেরই প্রাধান্য হ'ল। সাম্যবাদীরা দক্ষিণ ও পশ্চিম চীনে আড্ডা গেড়ে সে সব স্থলে সোভিয়েট বা সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্র গঠন করতে লাগল। চীন কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধনই হ'ল সাম্যবাদীদের লক্ষ্য। কৃষককে ঋণমুক্ত করে, আর নূতন নূতন যন্ত্র আমদানী করে সমবেত ভাবে চাষবাস করবার উপায় করে দিল তারা। জনসাধারণের ভেতরে শিক্ষা-বিস্তারেরও ব্যবস্থা করা হ'ল। আত্মরক্ষার জন্য গরিলা বা খণ্ড যুদ্ধে এদের লোকজন শিক্ষিত হতে লাগল। কুমিণ্টাং হ'ল চীনের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তাদের পক্ষে সোভিয়েট প্রাধান্য বরদাস্ত করা সম্ভবপর হ'ল

না। মার্শাল চিয়াং কাইশেক বার বার এদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। মোটামুটি বল্‌তে গেলে ১৯২৭ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত এরূপ আত্মঘাতী অভিযান চলে।

জাপান যেন এতদিন ওৎ পেতেই ছিল। চীনের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে তার জীগীষা বৃত্তি চরিতার্থ করতে অগ্রসর হ'ল। ১৯৩১ সালে চীনের কাছ থেকে কেড়ে নিল মাঞ্চুরিয়া। ১৯৩৩ সালে নিয়ে নিলে জেহোল প্রদেশ। উত্তর চীনের পাঁচটি প্রদেশেও তার ইচ্ছামত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'ল। লোকে তখন বলাবলি করতে লাগল, চিয়াং কাইশেক সাম্যবাদীদের দমন করতে গিয়ে চীনকে শেষ পর্য্যন্ত জাপানের হাতেই তুলে দিবেন! একথা কিন্তু ঠিক নয়। চীনের উপর জাপানের দাবি যতই বাড়তে লাগ্‌ল ততই সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী সকল দলের চীনেরাই বুঝতে পারলে যে, তাদের সত্যিকার শত্রু যদি কেউ থাকে তো ঐ জাপানীরা। ১৯৩৪ সালে চিয়াংকাইশেক সেনাদলকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করতে সুরু করেন। কিন্তু জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাপান প্রতিরোধে অগ্রসর হবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। সাম্যবাদীরাও ক্রমশঃ বুঝলে, নিজেদের আদর্শ মত যে-দেশ তারা গড়তে চাইছে তা যদি হাতছাড়াই হয়ে গেল তা হলে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কিরূপে? কাজেই উভয় পক্ষের ভেতরই জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝবার আগ্রহ প্রবল হয়ে

উঠল। পরে ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারপক্ষীয় সেনাপতি চ্যাং সুয়ে লিয়াং সিয়ান প্রদেশে নিজ অধ্যক্ষ চিয়াং কাইশেককেই আটক করে বসলেন! এর উদ্দেশ্য ছিল—কি সাম্যবাদী কি জাতীয়তাবাদী সকল শ্রেণীর চীনেই যে আজ জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়তে চাইছে তা তাঁর গোচরে আনা। চিয়াং মুক্তি পেলেন! বিশ্ববাসী বুঝতে পারলে, চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আর বেশী বিলম্ব নেই। জাপান কিন্তু শঙ্কিত হ'ল খুবই। বিরাট চীন যদি এক হয়ে তার বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে পারে তা হলে তা বড়ই ভীষণ ব্যাপার হবে তার পক্ষে। তাই ছ'মাস যেতে না যেতেই তুচ্ছ অছিলা করে সে পিকিঙের নিকটে চীনেদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়!

জাপান চীনের তুলনায় খুবই ছোট দেশ। লোকসংখ্যাও চীনের এক পঞ্চমাংশ। কিন্তু তা হলে কি হয়? জগতে যে ক'টি বড় বড় শক্তি আছে জাপান তার মধ্যে একটি। জাপানের ধন-সম্পদ, শিল্প-বাণিজ্য, নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী, ব্যোমবাহিনী যে কোন বড় শক্তির সমান। চীনের শক্তি তার তুলনায় অতি সামান্য। ১৯১২ সালে রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা অবধি প্রথম-বার বছর তার কেটে গেছে অন্তর্বিপ্লবে। তার পরে রুশ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সংগঠন কার্য্য আরম্ভ হ'ল বটে, কিন্তু অন্তর্বিরোধ সুরু হওয়ায় তা-ও আর বেশীদিন চল্‌ল না। স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে চীনের পক্ষে আত্ম-সংগঠন

যে একান্ত আবশ্যক তা কিন্তু সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী উভয় পক্ষ ভাল করেই বুঝেছিল। কাজেই উভয়েই নিজ নিজ আদর্শ মত চীনের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করছিল। এ সময়ের ভেতরে চীনের বহুস্থানে রাস্তা ঘাট নির্ম্মিত হয়, রেলপথ স্থাপিত হয়, নদী থেকে খাল কেটে জল সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হয়। বিদেশীর অর্থে কৃষি শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হতে থাকে কিছু কিছু। সাম্যবাদী দলে রুশ আর জাতীয়তাবাদী দলে জার্ম্মাণ সমরনীতি-বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত হয়ে স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী পুনর্গঠিত করা হ'ল; নৌবাহিনীরও পত্তন হ'ল এ সময়। কিন্তু চীনের মত বিশাল দেশের আত্মরক্ষার পক্ষে, আর জাপানের মত প্রবল শত্রুর সঙ্গে যুঝবার পক্ষে এ হ'ল খুবই সামান্য। তবে দু' দল একত্র হয়ে চেষ্টা করলে কয়েক বছরের মধ্যেই শক্তিশালী হতে পারত। জাপান চীনেদের এ অবসর দিলে না!

চীন-জাপান লড়াই আজ দেড় বছরের উপর চল্‌লেও জাপান কিন্তু একে লড়াই বলে স্বীকারই করছে না! চীনেরা আবার একটা জাতি হ'ল কবে যে, তাদের স্বীকার করে নিয়ে একে লড়াই বল্‌তে হবে! চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজ নিজ ইচ্ছা মত চলেছে, কেউ রুশীয় সাম্যবাদেব প্রশ্রয় দিয়েছে, কেউ প্রশ্রয় দিয়েছে ব্রিটিশ ও মার্কিন ধনতন্ত্রের। এ দুয়ের কোনটাই জাপানের কাম্য নয়। সকলকে বর্জ্জন

করে চীনেরা তার কথামত চলবে এ-ই সে সর্ব্বান্তঃকরণে চায়। চীনেরা কিন্তু তার এ কামনা পূরণ করতে রাজি নয়। তাই তারা তাদের যৎ সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়েই আজ প্রবল জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে সুরু করেছে। যদি আজকের চীনের একটি মানচিত্র তোমরা পাও, তা হ'লে দেখতে পাবে, উত্তর চীন প্রায় সবটা, আর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ চীনের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অনেকটা, অর্থাৎ চীনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আজ জাপান অধিকার করে ফেলেছে! চীনের ধনসম্পদের অর্দ্ধেকটাও নাকি এখন জাপানীদের হাতে। এতেও কিন্তু চীনেরা দমে যায়নি। নানকিং, হ্যাঙ্কৌ ধ্বংসের পর এখন পশ্চিম চীনের চুংকিঙে চীনেরা রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছে। জাপানীরা যত জায়গা দখল করেছে তার বেশীর ভাগই করেছে এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুড়ে। চীনেরা যে-সব স্থান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, সে-সবই তারা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে। আবার এসব স্থানে এখনও যে সকল চীনে বসবাস করছে তারাও কিন্তু সুযোগ পেলে জাপানীদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। চীনেরা গরিলা যুদ্ধ করে জাপানী সেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। তবে চীন-জাপান লড়াইয়ের পরিণতি সম্বন্ধে এখনো কিন্তু কিছুই বলা যাচ্ছে না।

রুশিয়া বাদে কোন বিদেশীই ইতিপূর্ব্বে চীনকে কোন রকম সাহায্য করেনি। ইদানীং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে

কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করছে। এখন চীনের উত্তর, পূব, দক্ষিণ সব দিকই জাপান আগ্‌লে বসেছে। কাজেই আজকাল রেঙ্গুন থেকে উত্তর ব্রহ্মের ভেতর দিয়েই চীনের ইউনান প্রদেশে অস্ত্র-শস্ত্র চালান দেওয়া হচ্ছে। ন' মাসের ভেতর চীনেরা তের শ' মাইল দীর্ঘ রাস্তা তৈরী করেছে এখানে! স্বাধীনতা রক্ষায় তারা যেমন দৃঢ়সংকল্প তাতে বিশ্বাস হয় এ লড়াই অনেক দিন চল্‌বে। জাপান-কর্তৃপক্ষ বলেছেন, এ লড়াই দশ বছরও চল্‌তে পারে! তাঁরা এতদিনে চীনের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার কতকটা আস্বাদ পেয়েছেন বলে মনে হয়। চীনের এ স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাধীন জাতি-মাত্রেই তাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছে। ভারতবাসীর সাহায্য করবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। তবু সে চিকিৎসক ও ঔষধপত্র পাঠাচ্ছে আহত চীনেদের সেবা শুশ্রূষার জন্য।

আজ চীনের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত। বাঁচবার জন্যই আজ সে সমস্ত কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এ সময় তার সংগঠনমূলক কার্য্যের কথা লোকের মনে না আসাই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের যে-সব স্থানে কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছে সে-সব স্থানে সরকারী ভাবে মাদক-দ্রব্য বর্জ্জনের উদ্যোগ-আয়োজন চল্‌ছে। চীনদেশে এ চেষ্টা কয়েক

বছর আগেই সুরু হয়েছিল। লোকে এখনও চীনেদের আফিমখোর বলে। চীন-সরকার আইন করে আফিম সেবন একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে আফিম-সেবীর শাস্তি হ'ল প্রাণদণ্ড! চীনেরা এ বিপদের ভেতরেও কিন্তু বিদ্যাভ্যাস বন্ধ করে নি। জাপানীদের অত্যাচারের ভয়ে যত দূরেই সরে যাক্ না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, গ্রন্থাগার সবই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে তারা! চীনের শাসন ব্যাপারে এখন যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা ত জানা কথা। তথাপি কি ভাবে ওদেশ শাসিত হচ্ছে তাও তোমরা নিশ্চয়ই জান্‌তে চাইবে। তোমরা একাধিক বার 'কুমিণ্টাং' কথাটির উল্লেখ পেয়েছ। সান-ইয়াৎ-সেন এর প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের দেশে যেমন কংগ্রেস, চীনে তেমনি কুমিণ্টাং। কুমিণ্টাংই চীনে সর্ব্বেসর্ব্বা—এর নির্দ্দেশ মতই সেখানে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। মন্ত্রীসভা এরই নির্দ্দেশে গঠিত হয়, এবং দায়ীও থাকে এর কাছেই। কুমিণ্টাং ছাড়া অন্য কোন দল সেখানে স্বীকৃত হয় না। আজকাল সাম্যবাদীরাও এই কুমিণ্টাং দলভুক্ত হয়ে দেশ-শাসন, দেশ-রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে সহযোগিতা করছে। চিয়াং কাইশেক যদিও সেনাধ্যক্ষ, তথাপি তিনিই সব কলকাঠি চালাচ্ছেন। আর এতে সহযোগী হয়েছেন তাঁরই যোগ্য সহধর্ম্মিণী মাদাম চিয়াং কাইশেক।

—দুই—

জাপান

চীনের কথা তোমরা এইমাত্র শুন্‌লে। চীন আমাদের নিকট প্রতিবেশী। তার বিপদ আমাদেরও কম চিন্তার উদ্রেক করে না। জাপান, চীনের ভেতর এতখানি এগিয়ে এসেছে যেখান থেকে ভারতবর্ষের সীমা মাত্র পাঁচ শ' মাইল দূরে! চীন আজ রাহুগ্রস্ত। কিন্তু সমগ্র এশিয়াই এতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কারণ চীন দুর্ব্বল বা পরাধীন হয়ে পড়লে জাপানের দুর্ব্বার শক্তিকে বাধা দিতে পারে এমন কেউ আর এখানে থাকবে না। এতদিন সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে ইউরোপবাসীরা এসে সমগ্র প্রাচ্যদেশকে তচ্‌ নচ্‌ করে দিয়েছে, এখন দিচ্ছে ঘরের শত্রু বিভীষণ! তাই জাপানকে সকলেই আজ এত ভয় করছে।

তোমরা জাপানের মানচিত্র নিশ্চয় দেখে থাক্‌বে। কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি হ'ল এই জাপান। আয়তনে বাংলা-বিহারের মত হবে, লোকসংখ্যা প্রায় সাত কোটি। তবে সাম্রাজ্য নিয়ে এর আয়তন আরও বেশী। নিজ জাপান ও তার সাম্রাজ্য এ দুয়ের লোক সংখ্যা দশ কোটির কাছাকাছি হবে। আজ এহেন ছোট দেশের তাপে এশিয়াবাসী

সব জ্বলে পুড়ে মরছে! চীনে তার নৃশংস অভিযান সকলকেই বিদ্বিষ্ট করে তুলেছে।

জাপান বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল বহু শতাব্দী আগে। বাইরের কোন লোক বেড়াতে, ব্যবসা করতে, বসবাস করতে, এক কথায় কোন কিছু করতেই সেখানে যেতে পারত না। সে নিজের ভেতরেই নিজে আবদ্ধ হয়ে ছিল। অবশেষে, কমোডোর পেরি নামে একজন আমেরিকান নাবিক গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি বহু সাধ্যসাধনা করে জাপানীদের অনুমতি দিতে রাজি করালেন সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য। তারপরে ১৮৬৭ সালে সম্রাট মেইজী আইন করে সব বাধা-নিষেধ তুলে নিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে জাপানীদের পুরোপুরি সংযোগ ঘট্‌ল এ সময় থেকে। জাপানের অভিজাত সম্প্রদায়ের নাম সামুরাই। তারাই পূর্ব্বে দেশ শাসন করত। রাজা ছিলেন তাদের হাতের পুতুল। কিন্তু মেইজী ছিলেন জবরদস্ত সম্রাট। তিনি সামন্ততন্ত্র তুলে দিলেন, সামুরাইদের ক্ষমতাও হ্রাস পেল। তিনি শাসন ব্যবস্থা নিজ ইচ্ছামত ঠিক করে নিলেন। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে নানাবিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য জাপানী যুবকগণ ইউরোপ আমেরিকায় যেতে লাগ্‌ল। পাশ্চাত্যের শিক্ষা দীক্ষা তাদের প্রাণে নব বল, নূতন আশার সঞ্চার করল।

১৮৮৯ সালে নূতন শাসনতন্ত্র চালু হয় জাপানে,—ঠিক পাশ্চাত্যের আদর্শে। সম্রাট, প্রিভি কাউন্সিল, কেবিনেট বা মন্ত্রীসভা, ইম্পিরিয়াল ডায়েট বা প্রতিনিধি-পরিষদ (প্রতিনিধি-সভা ও লর্ড-সভা) ঠিক বিলেতের অনুকরণেই এসব করা হয়েছে। লর্ড সভার সদস্য-সংখ্যা ৪০৪ জন। রাজ-পরিবার ও অভিজাত সম্প্রদায় থেকে এ সভার সভ্য মনোনীত হন। প্রতিনিধি-সভা বিলাতের হাউস অফ্ কমন্সেরই মত। এর সদস্য সংখ্যা ৪৬৬ জন। প্রতি এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার লোকের উপর একজন করে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। পঁচিশ বছর বা তদূর্দ্ধ সকল পুরুষই নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারেন। ত্রিশ বছরের কম হলে কেউ এ সভার সভ্য হতে পারেন না। প্রতিনিধি-সভায় বিভিন্ন দলও রয়েছে। এদের ভেতর দু'টি দল প্রধান, নাম—সিজুকি ও মিন্‌সিটো। বিলাতে যেমন কন্‌সারভেটিভ বা রক্ষণশীল ও লিবার‍্যাল বা উদার-নৈতিক দল আছে এ-ও ঠিক তেমনি। এ দু'টি দলই কমবেশী পার্লামেণ্টারী বা গণতন্ত্রমূলক শাসনের পক্ষপাতী।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখ্‌তে হবে। পাশ্চাত্যের আদর্শে শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হ'ল বটে, কিন্তু সম্রাট ক্রমে পূর্ব্ব প্রভাবই ফিরে পেয়েছেন। জাপানের সৈন্যদল কিন্তু কখনও গণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতি পছন্দ করে নি। তারা আবাহমান কাল থেকেই প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের

অধীন। তারা অন্য কারোর কর্তৃত্ব স্বীকার করতে রাজি নয়। সৈন্যদলকে কেন্দ্র করে জাপানে একদল উগ্র জাতীয়তাবাদীর উত্থান হয়েছে। জেনারেল আরাকি হলেন এ দলের নেতা। তিনি 'কোডো' নামে এ দলের এক রকম দর্শন প্রণয়ন করেছেন। এদের বিশ্বাস, "জাপান সম্রাট, জাপান জাতি, জাপানের জলবায়ু, তরুলতা, পাহাড়-পর্ব্বত সকলই পরম পবিত্র বস্তু; জাপানীরা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি,—এ বিশ্ব তাদের পদতলে একদিন গড়াগড়ি যাবে"! আবার জাপানের পৌরাণিক কাহিনীকে তারা সত্য দর্শন বলে প্রচার করছে। "জাপান সম্রাট সূর্য্য দেবতা আমাতেরাস্নুরের সাক্ষাৎ বংশধর! প্রায় আড়াই হাজার বছর যাবৎ এ বংশ জাপানে রাজত্ব করছে।" ধর্ম্মেও কিন্তু জাপ-সম্রাটের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকের ধারণা, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত বলে সম্রাটও একজন বৌদ্ধ। এ কিন্তু সত্য নয়। রাজ পরিবারের ধর্ম্ম আলাদা। 'শিণ্টো' হলেন তাদের দেবতা। জাপানের পুরাণশাস্ত্রে এর বিবরণ দেওয়া আছে। উগ্র জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাপ-সম্রাটের কুলজীরও খোঁজ নিচ্ছে আজ জাপানীরা!

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানীদের উগ্র মতবাদের বিকাশ হতে থাকে। এর প্রথম পরিচয় পাই ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে। জাপান চীনের সংস্পর্শে এসে অতীত যুগে সভ্য স্তরে উঠেছিল। চীনে ভাষাই

জাপানীদের ভাষা। চীনের সাহিত্য সংস্কৃতিতেই তারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত, কাজেই এ দিক দিয়ে এককালে চীন-জাপান ছিল অভিন্ন। পরে অন্যান্য বিদেশীর মতই জাপান কিন্তু চীনের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে থাকে। চীনের ধনসম্পদের কথা আগেই তোমরা শুনেছ। তার অনৈক্য ও শক্তিহীনতা ক্রমে বিদেশীদের প্রলুব্ধ করল —তার ধনসম্পদের দিকে। বিদেশীরা নিজ নিজ ঘাঁটিও সেখানে আগ্‌লাতে লাগ্‌ল। জাপান তখন সবেমাত্র পাশ্চাত্য ধরণে যুদ্ধবিদ্যা শিখে শক্তি বাড়াতে স্থরু করেছে। ঐসময়ে (১৮৯৪-১৮৯৫) সে-ও চীনের ধনসম্পদে ভাগ বসাতে চাইলে। সে যুদ্ধে জয়ীও হ'ল। কিন্তু আশানুরূপ কিছুই পেলে না। চীনে তখন ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও রুশ আড্ডা গেড়ে বসেছে। এদের ভেতর জাপানের মাথা গলানো খুবই কঠিন ব্যাপার। দক্ষিণ চীনের নিকটবর্ত্তী ফরমোসা দ্বীপটি কিন্তু সে এবারে পেয়ে গেল।

অতঃপর জাপানের কোপ পড়ল চীনের ঐ বিদেশীদের উপর। পাশ্চাত্য রীতিতে তার রণশক্তি দ্রুত বাড়ানো দরকার,—যদি ওখানে তাকে কিছু করে নিতে হয়। স্থলবাহিনী ও নৌ-বাহিনী সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা চল্‌ল। বিদেশে জাপানীদের পাঠানো হ'ল যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্য। এড্‌মিরাল তোগোর নাম তোমরা হয়ত শুনেছ। তোগো লণ্ডনে নৌ-বিদ্যা শিখেছিলেন। ১৯০৪ সালে পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানীরা

যে রুশকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তা তাঁরই রণচাতুর্য্যের বলে, বল্‌তে হবে। এ যুদ্ধে রুশরা হেরে যাওয়ায় লোকে বুঝতে পার্‌লে জাপানীরা এত অল্প সময়ের মধ্যে কতখানি শক্তিশালী হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে তখন রুশিয়াকে একটি খুব বড় শক্তি বলে সকলে জান্‌ত। তাকে হারিয়ে দেওয়া তো কম কথা নয়! রুশিয়াকে হারাতে ব্রিটেন নাকি জাপানকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল—একথাটি তেমন প্রকাশ নেই। জাপানের কূটনীতিরও তারিফ করতে হ'বে তা বলে। ব্রিটেন রুশিয়াকে শত্রু বলে মনে করত অনেকদিন আগে থেকে। তাই জাপান ১৯০২ সালে রুশ-শত্রু ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়! ঐ যুদ্ধের ফলে জাপান প্রাচ্যে প্রধানতম শক্তি হয়ে উঠ্‌ল। সে মাঞ্চুরিয়া রেলপথের কর্ত্তৃত্ব রুশ থেকে কেড়ে নিলে।

জাপানের শক্তিসাধনা পুরাদমেই চল্‌ল। ১৯১০ সালে কোরিয়া অধিকার করে নিল—বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যও বাড়াতে চেষ্টা করলো সে। যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করতে হলে যে-সব কাঁচা মাল আবশ্যক, তা জাপানে উৎপন্ন হয় না—অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তেল, লোহা, রবার বিদেশ থেকে আমদানী না হলে তার সব কাজই প্রায় অচল হয়ে পড়ে। ইংরেজের সঙ্গে সে সন্ধিবদ্ধ। ১৯০২ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত এ সন্ধি বলবৎ ছিল। কাজেই মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে দশ-বার বছর প্রাচ্যে তার বাণিজ্য ও শক্তি নির্বিঘ্নে প্রসার

লাভ করতে পেরেছিল। আর ব্রিটিশের আওতায় ছিল বলে অন্য কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভরসা পায় নি।

এর পর বাধল মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধ হ'ল যেন জাপানের পক্ষে আশীর্ব্বাদ! জার্ম্মাণীকে ঠেকাবার জন্য ইউরোপে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল; যুক্তরাষ্ট্রও পরে এসে এদের সঙ্গে যোগ দেয়। এখানে একটি কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে। পোর্ট আর্থারের যুদ্ধের পর রুশ শক্তি অনেকটা খর্ব্ব হয়ে পড়ে। তার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, বিশেষ করে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় ইংরেজ তার সঙ্গেও সন্ধি করে নিলে। ইংরেজের বন্ধু হ'ল জাপান। জাপান রুশিয়াকে কোন দিনই ছু' চক্ষে দেখতে পারে নি। অতঃপর কিন্তু তাকে রুশিয়ার বন্ধু রূপেই চল্‌তে হ'ল। প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও পূর্ব্ব সাম্রাজ্যগুলি রক্ষার ভার পড়ল জাপানের উপর। জাপান নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজ সমাধা করল। বলা বাহুল্য, এর ফলে প্রাচ্যে জাপানের শক্তি প্রবল হ'য়ে উঠে। এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে তারই একচেটিয়া হবার উপক্রম হয়। তার যে রাজ্য-ক্ষুধা প্রবল তা প্রকাশ হয়ে পড়ল, এই মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি—যখন সে চীনের উপর তার একুশটি দাবি পেশ করে বস্‌ল! আর্থিক, রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকারে চীনকে করায়ত্ত করবার ইচ্ছা ছিল তার। মিত্রশক্তিরা কিন্তু এতে

একযোগে বাধা দিলে। শেষে জাপান তার দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল। যুদ্ধের পরে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুব রেখার উত্তর দিকস্থ জার্ম্মাণীর উপনিবেশগুলি সবই পেয়ে গেল!

এত দিন মিত্রশক্তিরা অন্য কথা ভাব্বার অবসর পায়নি। যুদ্ধের পর তারা, বিশেষ করে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র, বুঝলে, এশিয়ায় জাপানের শক্তি যেমন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তাতে তাকে সময় থাক্তে ঠেকাতে না পারলে পরে বাগ মানানো সম্ভব হবে না। চীন প্রসঙ্গে তোমাদের ওয়াশিংটন চুক্তিগুলির কথা বলেছি। এ সব চুক্তির উদ্দেশ্যই ছিল জাপানের শক্তির রাশ টেনে ধরা। জাপান তখন ঐ চুক্তিগুলিতে রাজি হয়। হয়ত জাপানের পক্ষে তখন এতে সম্মত না হয়ে উপায়ও ছিল না। ব্রিটেন ও জাপানের ভেতর বিশ বছর যাবৎ যে সন্ধি বলবৎ ছিল এর পর তা বাতিল হয়ে গেল।

ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন উপনিবেশগুলিতে জাপানীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা হ'ল এর পর থেকে। ও-সব স্থলে প্রবেশের পক্ষেও নানা বাধা-নিষেধ সৃষ্টি করা হ'ল। বলা বাহুল্য খাস আমেরিকায়ও জাপানীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করা হ'ল এ সময়ে।

ব্রিটেন এত কাল ছিল সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিপতি। যুদ্ধের পরে কিন্তু তার এ দাবি টিক্‌ল না। একদিকে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্য দিকে জাপান তার সঙ্গে আড়ি দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। ওয়াশিংটনে বসে রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে একটি নৌ-চুক্তিও বিধিবদ্ধ হয়। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে নৌবহরের অনুপাত ঠিক হয় ৫ঃ ৫ঃ ৩। অর্থাৎ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যেকেরই নৌবহর সমান সমান হবার কথা হয়। আর এদের যদি থাকে পাঁচখানা করে জাহাজ, তবে জাপানের থাক্‌বে তিন খানা। জাপান এ প্রস্তাবেও রাজি হয়েছিল। কিন্তু পুনরায় যখন ১৯৩০ সালে লণ্ডনে বসে এ অনুপাত বাহাল করা হ'ল, তখন জাপানীদের ভেতরে খুবই বিক্ষোভ দেখা দিল। এর ফলে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জাপানী আততায়ীদের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন!

এর পর থেকে ধীরে ধীরে জাপানে সৈন্যতন্ত্রেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আগে বলেছি, জাপ-বাহিনী স্বয়ং সম্রাটের অধীন, মন্ত্রীসভার বা পার্লামেণ্টের কোন তোয়াক্কা তারা রাখে না। চীনকে নিজেদের মতে চালানো জাপানী মাত্রেরই অভিপ্রায়। চারদিকে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের হানি ঘটাবার চেষ্টা চলেছে তখন জাপানীরা এজন্য চীনের উপরই নির্ভর করলে বেশী। জাপানের সৈন্যতন্ত্র কিন্তু অধীর হয়ে উঠ্‌ল। চীনকে একেবারে গ্রাস করে ফেলতে চাইল তারা। তারা এ বিষয়ে আরো জোর পেল, যখন তারা দেশবাসীকে বোঝাতে পারল যে, এখনই চীনে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে

তাদের আজন্ম-বিরোধী রুশিয়া সেখানে নিজ শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে থাক্‌বে। ইটালী ও জার্ম্মাণীর মত জাপানও বরাবর রুশকে শত্রু হিসাবে সম্মুখে রেখে সব কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করছে। ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া অভিযান, ১৯৩৩ সালে জেহোল অধিকার ও অন্যান্য বহু কাজই সৈন্যতন্ত্র' নিজ দায়িত্বে করেছিল! এরপর জাপান নৌচুক্তি অস্বীকার করে নৌবহর বাড়াতে লাগ্‌ল। তাদের যুদ্ধব্যয় ভয়ানক রকম বেড়ে গেল। জাপান মন্ত্রীসভা কিন্তু সৈন্যতন্ত্রের অভিপ্রায় অগ্রাহ্য করে গত ১৯৩৬ সালের বজেটে যুদ্ধখাতে কম করে টাকা ধরতে চেয়েছিলেন। এর পরিণাম কি ভীষণ হয়েছিল জান? সৈন্য-দল জোট করে এক রাত্রিতেই পাঁচ সাত জন মন্ত্রীকে খুন করে ফেলে! সৈন্যদের কারো কারোর অবশ্য কঠোর শাস্তি হয়েছিল। কিন্তু এই একটি ঘটনা থেকেই তোমরা বুঝতে পার সৈন্যতন্ত্র জাপানে কিরূপ প্রবল হয়ে পড়েছে। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে জাপান জার্ম্মাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়। উভয়েই স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলে যে, রুশিয়ার সাম্যবাদ তাদের ঘোরতর শত্রু। একে তারা ঠেকাবেই। তখন কেউ ভাবেনি যে, এর পরেই জাপান চীনের উপর চড়াও হবে। কিন্তু হ'ল তাই-ই, ছ' মাস যেতে না যেতেই তুচ্ছ অজুহাতে জাপান চীন আক্রমণ করে বসল।

জাপানে এখন সৈন্যতন্ত্রই প্রবল। সিজুকাই ও মিনসিটো দলের ক্ষমতা ঢের হ্রাস পেয়েছে। চীন প্রসঙ্গে তোমাদের

বলেছি, দেড় বছরের উপর চীন-জাপানে লড়াই চলছে। চীনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, সহর, বন্দর ও রেলপথ আজ জাপানীদের কবলে। তবুও কিন্তু চীনেদের সায়েস্তা করা সম্ভব হচ্ছে না। জাতীয় জীবনে জটিল অবস্থার উদ্ভব হলে জাপানে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল নামে একটি সভা আহ্বানের ব্যবস্থা আছে। দেশের পদস্থ, গণ্যমান্য, দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এতে আহূত হয়ে থাকেন। জাপানের ইতিহাসে এযাবৎ চারবার মাত্র এ কাউন্সিল বসেছে। এই চীন-জাপান লড়াইয়ের সময় আবার এই সভা আহ্বান করা হয়েছে! মন্ত্রীসভার ক্রমশঃই রদবদল হচ্ছে। কিসে কি করা হবে জাপানীরা যেন তা ঠিক করতে পারছে না। এখানে একটি কথা তোমাদের বলে রাখি। চীন-জাপান লড়াইয়ের খবর খুব কমই কিন্তু জাপানে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়। যে-সব স্থলে জাপানীরা জয়লাভ করেছে বা চীনেদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তারই মাত্র উল্লেখ থাকে ওখানকার সংবাদপত্রে। এ হিসাবে চীন-জাপান লড়াইয়ের কথা জাপানীদের চেয়ে আমরাই কিন্তু বেশী জানি! আজ আন্তর্জাতিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছে। ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনীর দাপটে সকলেই আজ উদ্বিগ্ন। আপন ঘর সামলাতেই সকলে ব্যস্ত। জাপান এই সুযোগে তাড়াতাড়ি চীন জয় কার্য্য সমাধা করতে চাইছে। বিভিন্ন দিক থেকে তাকে আক্রমণ করবার আয়োজনও করছে তারা।

জাপান যখন পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে বিরাট শক্তি রুশিয়াকে হারিয়ে দিলে তখন এশিয়াবাসীরা আশ্বস্ত হয়েছিল। তাদের আশা হয় জাপানের মত তারাও একদিন ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলিকে তাড়িয়ে দিতে পারবে। তারা তখন জাপানকে অভিনন্দিত করল এশিয়ার 'নবারুণ' বলে। চীন নেতা ডক্টর সান-ইয়াৎ-সেন প্রচার করেছিলেন, 'এশিয়া হবে এশিয়াবাসীর জন্য'। তাঁর এই স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হবে জাপানের সাহায্যে,—সাধারণে এই ভেবেছিল। জাপানীরা মুখে অবশ্য আজও এ কথাই বলে। কিন্তু তাদের নৃশংসতা যেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে এসিয়াবাসীরা নিতান্তই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশী চীনের উপর জাপানীদের নির্ম্মম অত্যাচার চেঙ্গিস খাঁর অত্যাচারকেও হার মানিয়ে দিয়েছে! দুর্ব্বল বা অধীনস্থদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যবহার সকলেরই প্রায় একরূপ। তাই একজন স্বার্থপরকে তাড়িয়ে আর একজন স্বার্থপরের সুবিধা করে দেওয়া কেউই যুক্তিযুক্ত মনে করে না।

এশিয়ার অধিকাংশ দেশই দীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় আত্মরক্ষার জন্য সামান্য সামর্থ্যও অর্জ্জন করতে পারেনি। কথা হয়েছিল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভাবে স্বাধীন হবে আগামী পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে। ফিলিপিনোরা কিন্তু এখন আগামী ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত এ প্রস্তাব মূলতবী রাখ্‌তে চাইছে! কারণ তাদের ভয়, যুক্তরাষ্ট্র

সরে দাঁড়ালে জাপানের সম্মুখে তার নিজ স্বাধীনত রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। জাপানের তুলনায় তাদের আত্মরক্ষার আয়োজন খুবই সামান্য। আত্মরক্ষা করতে হলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য তাদের পক্ষে একান্ত দরকার।

অষ্ট্রেলিয়া যদিও একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ তথাপি সে নিজেকে সামলাবার জন্য নিজ দায়িত্বে সৈন্যসামন্ত ও নৌবহর বাড়িয়ে নিচ্ছে। বিপদের সময় অবশ্য ব্রিটেনের সাহায্য পাওয়া যাবে। ব্রিটেন সিঙাপুরে এত টাকা ব্যয় করে যে নৌ-ঘাঁটি নির্ম্মাণ করেছে তাও প্রধানতঃ জাপানকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, বোর্ণিও, সেলিবিস ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপগুলি অধিকাংশই হল্যাণ্ডের অধীন। এখানকার অধিবাসীরা পরাধীন, তথাপি জাপানী নৃশংসতায় তারা নিতান্তই হতভম্ব হয়ে পড়েছে। এ-ও শুনা যাচ্ছে, জাপানীদের নজর এসব স্থলের উপর খুব বেশী। কারণ তেলের খনি বিস্তর রয়েছে এখানে। শ্যাম নিরপেক্ষ থাক্‌বে বল্‌ছে। ফরাসী ইন্দো-চীনেরও একেবারে কাছে এসে পড়েছে—জাপান। ভারতবর্ষ আত্মরক্ষা করতে কতখানি অসমর্থ তা তোমাদের আগেই বলেছি। এ অবস্থায় সমগ্র এশিয়াবাসী যে আজ খুবই চঞ্চল হয়ে উঠ্‌বে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

—তিন—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

তোমরা ভূগোল নিশ্চয়ই পড়ছ। তাতে দেখ্‌বে, ভূমণ্ডলকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছে—পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ। শেষোক্তটিকে আবার 'নূতন জগৎ'-ও বলা হয়। আমেরিকাই এই পশ্চিম গোলার্দ্ধ বা নূতন জগৎ। আগে লোকে এ দেশটির কথা জান্‌ত না। কলম্বস ১৪৯২ সালে ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়ে ভ্রমক্রমে এই নূতন দেশ আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হন! এজন্য তিনি ও তাঁর পরবর্ত্তী লোকেরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ'। অবশ্য এখন এমন কতকগুলি পুরাতন মন্দির ও মূর্ত্তি সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে বুঝা যাচ্ছে হয়ত কোন অতীত যুগে ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার সঙ্গে এর যোগস্থাপন হয়েছিল। এখন পর্য্যন্ত সুধীসমাজে এ মতবাদ তেমন গ্রাহ্য হয়নি।

বর্ত্তমানে কিন্তু এশিয়ার সঙ্গে তার যোগ খুবই। এ সম্বন্ধে বলবার আগে তোমাদের আর একটি কথা বলে রাখ্‌ছি। আমেরিকা বলতে আমরা সাধারণতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝি। এ অর্থে আমরা অনেক সময় এ কথাটি ব্যবহারও করেছি। আসলে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র আমেরিকার একটি অংশ

মাত্র। আমেরিকা দুটি মহাদেশে বিভক্ত—উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। যুক্তরাষ্ট্র এই উত্তর আমেরিকারই মধ্যেকার একটি অঞ্চল। এ ছাড়া উত্তর আমেরিকায় নাম করা দেশ রয়েছে কানাডা ও মেক্সিকো। দক্ষিণ আমেরিকায় আছে এগারটি রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সকলেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে এই যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকা বল্‌তে যে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝায় তাও বোধ হয় এই কারণেই।

এশিয়ার সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারেই যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ যোগ। সে না হলে এখানকার কোন সমস্যারই যেন সমাধান হয় না। কোন কোন বিষয়ে তাকে অগ্রণী হতে বা নেতৃত্ব করতেও দেখা গেছে। এর কারণ কি? ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপানের মত তারও বিশেষ স্বার্থ রয়েছে পূর্ব্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ তার অধিকারে রয়েছে আজ চল্লিশ বছরের উপর। চীনের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে তার স্বার্থ ঢের বেশী। জাপানের সময় তোমরা শুনেছ যুক্তরাষ্ট্রের কমোডোর পেরী প্রথম জাপানকে রাজী করান বিদেশীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। সেই থেকে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই চালু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি এশিয়ার বাজারের উপরও কম নির্ভর করে নি। জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার ও বর্ত্তমান চীন-জাপান লড়াই

তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে উদ্বিগ্ন করে তুল্‌বে তা কি আর বল্‌তে? ফিলিপাইনের কথা আগে তোমাদের কিছু বলেছি। এই ফিলিপাইনে ও প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে সে নৌঘাঁটি শক্ত করে স্থাপন করছে।

এশিয়ার নানা সমস্যায় যুক্তরাষ্ট্র যেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে, ইউরোপীয় ব্যাপারগুলিতে কিন্তু সে তেমন জড়িত হয়ে পড়তে চায় না। এর একটা কারণ অবশ্য এই যে, এশিয়ার মত ইউরোপে তার স্বার্থ তেমন নিবিড় হয়ে নেই। তবে ইউরোপে যদি কোন রাষ্ট্র প্রবল হয়ে উঠে,তা'হলে অন্যান্যের মত তারও ভাবনা বেড়ে যায়। এর ভেতরে তার আত্মরক্ষার প্রশ্ন যুক্ত হয়ে রয়েছে বলেই, বোধ হয়, এমনি হয়। গত মহাসমরে সে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দেয় জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে। আমেরিকা বাসীদের কিন্তু দেশ-রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দিয়েই তবে যুদ্ধে নামানো সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। রাষ্ট্র-সংঘের সভ্যও হতে সে রাজি হয় নি। তার মতে সে দৃঢ় রয়েছে বরাবর। ইদানীং কিন্তু আবার জার্ম্মাণীর ক্ষমতাধিক্যে যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। একথাও শোনা যাচ্ছে যে, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে যুক্তরাষ্ট্রেরও স্বাধীনতা বিপন্ন হবে! এবারেও দেশ-রক্ষার প্রশ্ন তুলেই তাকে ইউরোপের ব্যাপারে যুক্ত করাবার চেষ্টা চল্‌ছে। অবশ্য

একথা কেউই অস্বীকার করবেন না যে, জার্ম্মাণীর শক্তি যে রকম দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তাতে শুধু ছোট রাষ্ট্রগুলিরই নয়, বড় রাষ্ট্রগুলিরও ভয়ের কারণ রয়েছে যথেষ্ট। আর জার্ম্মাণীকে যদি বাধা দিতে হয় তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন হবেই। গত মহাসমরের চেয়ে এবারে এর সাহায্যের প্রয়োজন আরও বেশী। কারণ এবারে জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান একযোগে লড়াইয়ে নামবার সম্ভাবনা। ইউরোপ ও এশিয়া দুটি মহাদেশই আজ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাবার জন্য লালায়িত।

আগে বলেছি, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ইউরোপের নানা দেশ থেকে লোকজন গিয়ে অতঃপর এখানে বাসা বাঁধতে থাকে। আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানরা সুসভ্য ইউরোপীয়দের সম্মুখে দাঁড়াতে পারল না, আস্তে আস্তে সরে পড়ল তারা। এখন তারা প্রায় লোপ পেতে বসেছে! ইউরোপ থেকে কারা গিয়েছিল জান? মধ্যযুগে ধর্ম্ম নিয়ে বড়ই বাড়াবাড়ি চলেছিল ওখানে। খ্রীষ্টানদের ভেতর দু'টি দলের কথাই আমরা বিশেষ করে জানি—রোমান কাথালিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। এ ছাড়া আরও বহু দল রয়েছে এদের ভেতরে। এক দল আর এক দলের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। এদের মধ্যে পিউরিটান বা গোড়া নীতিবাদী এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। প্রোটেষ্টাণ্ট দল থেকেই তাদের উদ্ভব, কিন্তু রোমান কাথলিক বা প্রোটেষ্টাণ্ট কেউই তাদের দেখ্‌তে

পারত না। বিভিন্ন দেশেই এ দল দেখা দিয়েছিল। তারা শেষ পর্য্যন্ত নূতন দেশ আমেরিকায়ই আশ্রয় খুঁজে নিলে। পরে অনেকেই অবশ্য সেখানে গিয়েছে, কিন্তু এরাই প্রথমে গিয়ে আমেরিকাকে বাসোপযোগী করে তুলে। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। আবার, এদের ভেতর অধিকাংশই হ'ল ইংরেজ। কেননা, ইংরেজই ছিল এ দেশের মালিক। হিসাব করে দেখা গেছে, শতকরা ছেচল্লিশ জন গিয়েছে ইংলণ্ড থেকে, বাকী চুয়ান্ন জন গিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। কাজেই ইংরেজ ও ইংরেজীর প্রাধান্য আজ সেখানে। যদিও ইংরেজ বলে আজ কেউ নিজেদের পরিচয় দেয় না, তথাপি যুক্ত রাষ্ট্র ইংরেজী সভ্যতাকেই বরণ করে নিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজ-অইংরেজ সকল অধিবাসীই প্রভু ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করে। এর ইতিহাস পরে তোমরা বিশেষ করে জান্‌তে পারবে। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তেরটি প্রদেশ কংগ্রেসে মিলিত হয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তারপর দীর্ঘকাল ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চলতে থাকে। ছ' বছর পরে ১৭৮২ সালের নবেম্বর মাসে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। পর বছর উভয়ের ভেতর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সন্ধি হয়। স্বাধীন যুক্ত-রাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্র স্থির হয় এর চার বছর পরে। এর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত যদিও একুশবার শাসন-তন্ত্রের সংশোধন করা হয়েছে,

তথাপি মূলতঃ এ আগের মতই আছে। তোমাদের আগে বলেছি, ফ্রান্সের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রও একটি ষোল আনা গণতন্ত্র। এখানকার প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি প্রতি চার বছর অন্তর গণভোটে নির্ব্বাচিত হন। কংগ্রেসের মত অনুসারে মন্ত্রীদের সাহায্যে তিনি দেশ শাসন করেন। কংগ্রেসের দুটি বিভাগ, সেনেট ও হাউস্ অফ্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ্স্ বা প্রতিনিধি পরিষদ। যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে আটচল্লিশটি ষ্টেট বা রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে। এরা প্রত্যেকে দু' জন করে প্রতিনিধি সেনেটে পাঠায় ছ' বছরের জন্য। সেনেটের সদস্য সংখ্যা মোট ছিয়ানব্বই জন। ত্রিশ বছরের বা তদূর্দ্ধ বয়সী লোকেরা সেনেটের সভ্য হতে পারেন। প্রতিনিধি পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা চার শ' পঁয়ত্রিশ। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র দু' বছর। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ নিজ নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য গণভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়ে পরিষদে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা খুব বেশী, তথাপি কংগ্রেসের মত না নিয়ে তিনি কিছুই করতে পারেন না, বা নিজ দায়িত্বে কিছু করলেও পরে এদের সম্মতি নিতে হয় তাঁকে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সহজ হবে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ছিলেন রাষ্ট্র-সংঘ গঠনের মূলে; কিন্তু কংগ্রেসের সম্মতি না পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এর সভ্য হতে পারে নি!

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দু'টি প্রধান ঘটনা তোমাদের মনে রাখ্তে হবে। প্রথমটি হ'ল মনরো 'ডক্ট্রিন' বা মনরো

নীতি। ১৮১৭ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেম্‌স্ মন্‌রো আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁর আমলে এই নীতি চালু হয় বলে এর এই নাম দেওয়া হয়েছে। এর মর্ম্ম হ'ল এই যে, বিদেশ থেকে কেউ এসে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্বাধীন অঞ্চলই আক্রমণ বা ভোগ দখল করতে পারবে না। যদি কেউ এরূপ করতে চেষ্টা করে তা হলে যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বাধীনতা বিপন্ন বলে মনে করবে এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়বে। ও সময় আমেরিকার, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে, অন্য কেউ এসে তাদের উপর চড়াও হলে তারা নিজ নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পারত না। যুক্তরাষ্ট্র ওরূপ আইন পাশ করে এদের সুবিধা করে দিলে, নিজেও বৃহৎ ভূখণ্ডের নেতৃত্ব লাভ করলে। এক শ' বছরের উপর অতীত হয়ে গেছে, সে এখনও এই নেতার আসনেই সমাসীন রয়েছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পেরু রাজ্যের লিমা শহরে যে নিখিল আমেরিকান সম্মেলন হয়ে গেছে তাতে তার এই নেতৃত্ব সকলেই নূতন করে মেনে নিয়েছে। সকলেই প্রতিজ্ঞা করেছে যে, বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে লড়বে। মন্‌রো নীতি যাতে লঙ্ঘিত না হয় তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র শ্যেন দৃষ্টি রেখেছে। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে সে যোগদান করেছিল, মনে হয়, এই নীতিকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যই।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের আর একটি প্রধান কথা আমেরিকার নিগ্রো বা কাফ্রীদের স্বাধীনতা দান। নিগ্রোদের উপর অত্যাচার এখনও চলছে সেখানে, কিন্তু আগে যা অত্যাচার হয়ে গেছে তার তুলনায় এ কিছুই নয়। আমেরিকার তাজা জমি চাষ-আবাদের জন্য এই কালা আদমী নিগ্রোদের ক্রয় করে নিয়ে যাওয়া হত আফ্রিকা থেকে। তারা ছিল এক কথায় ক্রীতদাস। তোমরা বুকার টি ওয়াশিংটনের 'আত্মজীবনী'র কথা হয়ত শুনেছ। এ আত্মজীবনীর একখানি ভাল অনুবাদ-বই বাংলায় আছে। তিনি নিজে নিগ্রো, তাই এ বই থেকে তাদের সে সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে তোমরা। প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন (১৮৬১-১৮৬৫) এদের স্বাধীনতা দিয়ে দেন। এ নিয়ে আমেরিকায় ভীষণ গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। লিঙ্কন কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন। কিন্তু শেষে আততায়ীর হাতে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। নিগ্রোরা তখন থেকে আমেরিকায় স্বাধীনভাবে বসবাস করছে!

গত দেড় শ' বছরের অবিরাম চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র আজ ধন-সম্পদে, কৃষি-শিল্পে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-সভ্যতায় জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। সে সুদূরে পড়ে আছে বটে, তথাপি আজ যখনই যেখানে কোন সমস্যা দেখা দিচ্ছে অমনি তার ডাক পড়ছে। গত মহাযুদ্ধে আমেরিকা যোগ না দিলে মিত্রশক্তিদের পক্ষে জয়লাভ করা খুবই কঠিন হত।

আজ আবার তারই ডাক পড়েছে ইউরোপ ও এশিয়ার জটিল সমস্যা মীমাংসা করবার জন্য।

আজকের দিনে তার মতিগতি কিরূপ দাঁড়িয়েছে তা সম্যক্ বুঝতে হলে কিছু আগেকার কথা উল্লেখ করা দরকার। গত মহাযুদ্ধে কিছুদিন অর্থাৎ ভের্সাই সন্ধি পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তারপর সে আবার হাত গুটিয়ে নিলে। ইউরোপীয় ব্যাপারে সে আর যোগ রাখ্‌বে না বল্‌লে। কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়ে না হোক, অর্থনীতির দিক দিয়েও কিন্তু তাকে কতকটা সংস্রব রাখ্‌তে হয়েছিল। গত মহাযুদ্ধে সে বিস্তর টাকা ঢেলেছে ইউরোপের বাজারে—সে-সব আদায়ের উপায় তো দেখ্‌তে হবে? অর্থনীতি বিষয়ে যে-সব আন্তর্জ্জাতিক কমিটি বা সম্মেলন হ'ল তাতে সে যোগ না দিয়ে পারলে না। আবার বিভিন্ন দেশকে টাকাও সে ধার দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু এর বেশী আর সে এগোল না। এশিয়ার ব্যাপারে কিন্তু সে মোটেই উদাসীন রইল না। যুদ্ধের সময়ে ও পরে জাপান এখানে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাকে না ঠেকালে আমেরিকার স্বার্থ বিশেষ ভাবে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। এজন্য প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং (১৯২১—১৯২৩) ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এখানে যে-সব চুক্তি হয় তার আভাষ তোমাদের আগেই দিয়েছি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চতুঃশক্তি

চুক্তি, নবশক্তি চুক্তি, নৌ-চুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি চুক্তি হয়ে যায় এখানে। চুক্তিগুলি আলোচনা করলে দুটি বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায়—চীনকে স্বাধীন রেখে সেখানে সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল; আর এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান যাতে অবাধে নিজ শক্তি বাড়িয়ে না নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। আজ ষোল বছর পরে বুঝা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা মোটেই পূরণ হয়নি,—জাপান উগ্রভাবে নিজ শক্তি বাড়িয়ে চলেছে সেখানে!

এর পরে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বাজার মন্দার কথা তোমরা অনেকবার শুনেছ। ১৯২৯ সালের পর থেকে এ ব্যাপার সুরু হয়। বাজার মন্দা হবার কারণ কি? আর জগতের সব দেশেই-বা একই সময় এ দেখা দেয় কেন? এর অনেক কারণ আছে। একটির কথাই এখানে তোমাদের বলছি। আজকাল চলাচলের সুব্যবস্থা হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও খুব সুবিধা হয়েছে। এক দেশের মাল অন্য দেশে অনায়াসে যেতে পারে। কিন্তু ঐ সময় নিজ নিজ উন্নতির জন্য অনেকগুলি দেশ স্বয়ং-পূর্ণ হতে চায়, অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের তৈরী মাল ব্যবহার করবে, অন্যের মাল কিনবে না এরূপ সংকল্প করে। মুখে বল্‌লেই তো আর লোকে একথা শুন্‌বে না—তাই প্রত্যেকটি দেশ আইন করে বিদেশাগত জিনিষের উপর উচ্চ হারে

শুল্ক বসাতে লাগ্‌ল। এতে করে বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিবেগ ভীষণ ভাবে বাধা পেল। যদি এমন হত যে, প্রত্যেক দেশই সব বিষয়ে নিজের উপর নির্ভর করে থাক্‌তে পারত তাহলে এর ফল এত বিষময় হত না। কিন্তু ব্যাপার তো আর সে রকম হবার নয়। সকলকেই যে সকলের উপর নির্ভর করতে হয়। পাল্লা দিয়ে শুল্ক বাড়াবার ফলে প্রত্যেকেরই মালপত্র আটক পড়ে গেল। হিতে বিপরীত ফল হ'ল। প্রথম প্রথম নানা রকম সভাসমিতি হয়েছিল এর প্রতিরোধের জন্য, কিন্তু সকলেই নাচার। কাজেই প্রত্যেক দেশে মালপত্র জমে স্তূ্পীকৃত হয়ে উঠ্‌ল। ব্যবসা নাই, অর্থ আসবে কোথা থেকে? লোকের অর্থাভাব দেখা দিল খুবই।

এর ফলে অনেকে অনেক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। যুক্তরাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল খুবই। গত ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেণ্ট হয়ে ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট এর প্রতীকার করতে চেষ্টা করলেন নূতন ভাবে। যুক্তরাষ্ট্র কৃষি বা শিল্প বিষয়ে কারো মুখাপেক্ষী নয়। তিনি এসব সুনিয়ন্ত্রিত করে লোকের দুঃখ কষ্ট দূর করতে চেষ্টা করলেন। আমেরিকায় এক দিকে আছে প্রাচুর্য্য আর এক দিকে আছে দৈন্য। দামে সস্তা হবে—এ আশঙ্কায় কত বাড়তি গম যে সেখানে পুড়িয়ে ফেলা হয়, বা কত দুধ যে ঢেলে ফেলা হয় তার ইয়ত্তা নেই! রুজভেল্ট এরূপ বিষদৃশ ব্যাপারের সংস্কারে মন দিলেন। জমির মালিক ও চাষীর

ভেতরে নূতন বন্দোবস্ত তিনি করে দিয়েছেন যাতে দু' জনেই লাভবান হতে পারে। কারখানার মালিক ও শ্রমিকের ভেতরেও নানা ব্যবস্থা হয়েছে—মালিকের লাভের অঙ্ক খানিকটা কমিয়ে দিয়ে শ্রমিকের মুখে দুমুঠো অন্ন দেবার জন্য। শ্রমিকেরা এখন সংঘবদ্ধ হয়েছে। তাদের কাজের সময় ও বেতনের হারও অনেকটা নিয়ন্ত্রিত। ধনিকরা কিন্তু রুজভেল্টের উপর খুশী নয়, তথাপি বিশেষ উচ্চবাচ্য করতে পারছে না। রুজভেল্টের প্রেসিডেণ্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল দু' বছর আগে। তিনি এতটা জনপ্রিয় যে, দ্বিতীয় বারও বিপুল ভোটাধিক্যে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হয়েছেন। আগামী ১৯৪১ সালের গোড়াতেই এর মেয়াদ আবার শেষ হবে। পাশ্চাত্য দেশের কথা আলোচনার সময় একথাটি কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে যে, ওখানকার অধিবাসীদের জীবন-ধারণের মাপকাঠি আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। কাজেই এদেশের দারিদ্র্য আর ওদেশের দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্যও ঢের।

গত কয়েক বছর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আর একটা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে—প্রবল জাতিগুলি দুর্ব্বল জাতিদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। কারো কারো মতে পৃথিবীর সব কাঁচা মাল কয়েকটি জাতি আগ্‌লে রেখেছে বলেই এ ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে। যারা শক্তিমান, স্বাভাবিক ভাবে তাদের শক্তি বিকাশের পথ না পেয়ে এরূপ অস্বাভাবিক উপায় নাকি

অবলম্বন করেছে! মাঞ্চুরিয়া, আবিসিনিয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা-বিলোপ, স্পেনের অন্তর্বিপ্লব ও চীন-জাপান লড়াই সবই নাকি হয়েছে এই একই কারণে। যুক্তরাষ্ট্র এ সব ব্যাপারে নেই বলে একটা নিরপেক্ষ আইন পাস করিয়ে নিয়েছিল কিছুদিন আগে। এ আইনের মর্ম্ম এই যে, আমেরিকার বাইরে আক্রান্ত বা আক্রমণকারী কাউকে সে সাহায্য করবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে এ আইনের সংশোধন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। রুজভেল্ট এর সংশোধনের জন্য কংগ্রেসে সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন। ভাবী লড়াইয়ে হয়ত তাঁকে পক্ষ নিতে হবে!

নিরপেক্ষতা আইন সংশোধন করে রুজভেল্ট সমগ্র আমেরিকাকেই ইউরোপের রাজনীতিক সমস্যার সমাধানে আজ নিয়োজিত করতে চাইছেন; কিন্তু এশিয়া সম্পর্কে কোন কোন কাজ তিনি এর আগেই সুরু করে দিয়েছেন। এশিয়ায় তার স্বার্থ কত বিপুল তার আভাষ তোমাদের আগেই দিয়েছি। এখানে কোন গোলমাল উপস্থিত হলে বা তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে তার উদ্বেগ বেড়ে যাওয়ারই কথা। জাপানের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ খুবই, কিন্তু চীনে সে টাকা ঢেলেছে বিস্তর। তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য যে খুবই চল্‌ছে তা বলাই বাহুল্য। কাজেই ঐ দুটি দেশের মধ্যে বিবাদ স্থায়ী হওয়ায় তার উদ্বেগ ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে। উভয়ের

সঙ্গেই তার সম্পর্ক বিদ্যমান, তথাপি চীনের প্রতিই সে বেশী সহানুভূতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। অনেকে এ সহানুভূতিকে নিছক মৌখিক বলেছেন এ জন্য যে, জাপানকে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রয় করতে সে কখনো ক্ষান্ত হয়নি, বরং গত কয়েক বছর এসব বিক্রয় করে বেশ দু' পয়সা রোজগার করে নিয়েছে সে! কিন্তু আজ জাপান যতই চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে ততই তার ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। তার ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে! এত সাধের মুক্ত-দ্বার নীতি জাপানের এক হুমকীতে বানচাল হতে বসেছে! তাই ব্রিটেনের সহযোগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও চীনকে টাকা ধার দিচ্ছে, যাতে করে জাপানের সঙ্গে সে আরও কিছুকাল লড়তে সক্ষম হয়। কারণ অনেকের মত, তারও হয়ত ধারণা, জাপান চীনে বেশীদিন অভিযান চালাতে পারবে না। কারণ তার আর্থিক অবস্থা এর পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

—শেষ—

পরিশিষ্ট (ক)

জগতের বড় রাষ্ট্রগুলি কিরূপ যুদ্ধের আয়োজন করে চলেছে নিম্নের তালিকা থেকে তার কতকটা আভাষ পাওয়া যাবে। এসব তালিকা, দুটি কারণে কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রথমতঃ প্রতিদিনই রাষ্ট্রগুলি কিছু না কিছু রণশক্তি বাড়াচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ কার কতটা রণশক্তি আছে অনেকেই তা গোপন রাখ্‌তে চেষ্টা করছে। নৌ-বহরের হিসাব সংখ্যায় না দিয়ে পরিমাণে (টনেজ) দেওয়া হ'ল।

দেশ	নৌ-বহর (টনেজ)	প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ-বিমানপোত	বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্য
ব্রিটেন	১৯,০৪,০০০	২,৮০০-৩,৫০০	২,১৭,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	১৬,২০,০০০	২,১০০-২,৮০০	১,৭৮,০০০
জাপান	১১,২০,০০০	২,০০০-২,৮০০০	১২,৫০,০০০
ফ্রান্স	৭,৭৫,০০০	২,২০০-২,৮০০	৭,০৮,০০০
জার্ম্মাণী	৪,৬৫,০০০	৩,০০০-৪,০০০	১০,০০,০০০
ইটালী	৬,৭০,০০০	২,৮০০-৩,৫০০	৩,০০,০০০
সোভিয়েট রুশিয়া	৩,১৫,০০০	৩,০০০-৪,২০০	১৩,০০,০০০

পরিশিষ্ট (খ)

আলবেনিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে আড্রিয়াটিক সাগর তীরের একটি ক্ষুদ্র মুসলমান রাষ্ট্র। এর লোকসংখ্যা মাত্র দশ লক্ষ। বাংলাদেশের যে-কোন একটি জেলার লোকসংখ্যা এর চেয়ে বেশী। ইটালী অনেক দিন থেকেই একে হাত করতে চেষ্টা করছিল। সম্প্রতি সে একে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে! হিটলার মধ্য ইউরোপে আর মুসোলিনী ভূমধ্যসাগরে একই সময়ে প্রবল হতে চাইছেন।

"সাহসীর জয়যাত্রা" সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

"সাহসীর জয়যাত্রা" পড়িয়া মনে হইল, বহু উপকথা, গালগল্প, ভূতপ্রেতের কাহিনীতে ও কল্পিত য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উপহারে যে শিশু সাহিত্য ভারগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছে, শক্তিমান লোক অনায়াসে কচি মনগুলিকে তাহা হইতে মুক্তি দিয়াছেন।···উপকথা হইতে এগুলি সম্পূর্ণ পৃথক, পৃথক হইলেও কৌতুহল-সৃষ্টিতে ও রসপিপাসা পরিতৃপ্তিতে যে কোন রোমাঞ্চকর কাহিনী হইতে উৎকৃষ্টতর। **প্রবাসী** (মাঘ, ১৩৪৫)।

'সাহসীর জয়যাত্রা'য় বিদেশের সাতটি বড় লোকের জীবনী ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে,—সান-ইয়াৎ সেন, লেনিন, কামাল আতাতুর্ক, মাসারিক, মুসোলিনী, হিটলার ও ডি, ভ্যালেরা। এ ছাড়া মহাত্মাগান্ধী, জহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের জীবনীও আছে। ইঁহাদের কথা না জানিলে বর্ত্তমান পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া অসম্ভব। বইখানি আমাদের খুব বেশী ভাল লাগিয়াছে।

আনন্দ-বাজার পত্রিকা (২৫শে ভাদ্র, ১৩৪৫)।

The book contains eight sketches of the greats....... The book is extremely topical and proves interesting to the reader. The style......is forceful and lucid. This book should be a constant companion to those who intend to follow the contemporary world events carefully and well. **The Amrita Bazar Patrika** (18th Sept., 1938).

'দেশ', যুগান্তর, প্রবর্ত্তক, বঙ্গশ্রী, পাঠশালা, শিশুসাথী, জলছবি, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, এড্‌ভান্স প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকে উচ্চ প্রশংসিত।